স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতের কৃষি সংস্কার আইন
— পৃঃ ৫

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে হিন্দুদের অবদান যেন ভুলে না যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
— পৃঃ ২৮

৭৩ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ১৪ ডিসেম্বর ২০২০।। ২৮ অগ্রহায়ণ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

ধর্ম ও রিলিজন এক হতে পারে না

पतंजलि®
प्रकृति का आशीर्वाद
करोड़ों देशवासियों का
भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट
दन्त कान्ति
PATANJALI
DANT KANTI
TIGHTENS GUMS
FIGHTS GERMS
पतंजलि
दन्त कान्ति
मजबूत मसूड़े
कीटाणुओं से लड़े
PATANJALI
Dant Kanti
Medicated
PATANJALI
Dant Kanti
Junior
दन्त कान्ति के लाभ
✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।
✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।
✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।
पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए
आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।
पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है
पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद हैं, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध हैं।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৪ ডিসেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৪

আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতের কৃষি সংস্কার আইন
□ ড. রতন কুমার ঘোষাল □ ৫

ধর্ম ও রিলিজন এক হতে পারে না
□ গৌতম কুমার মণ্ডল □ ১১

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত সংজ্ঞা ও বর্তমান ভারত
□ রামানুজ গোস্বামী □ ১৩

কারা সারা বিশ্বকে রক্তরঞ্জিত করে চলেছে?
□ কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরি □ ১৫

খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীর সমর্থন ছিল ভারতের প্রতি চরম আঘাত □ নিত্যরঞ্জন দাস □ ১৯

কৃষক আন্দোলনে বামপন্থীদের সমর্থন বাস্তুঘুঘুদের হয়ে ওকালতি □ ড. সৌমেন ঘোষ □ ২২

মৌরসীপাট্টা বানচাল, দালালদের নাভিশ্বাস
□ অম্লান কুসুম ঘোষ □ ২৫

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে হিন্দুদের অবদান যেন ভুলে না যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা □ চন্দন রায় □ ২৮

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : মোক্ষ পুরুষার্থ ও শিক্ষা
□ ইন্দুমতী কাটদরে □ ৩১

কৃষিপণ্য বিপণন কমিটি নিয়ে ইচ্ছাকৃত ধাঁধা তৈরি হচ্ছে
□ অরবিন্দ পানাগড়িয়া □ ৩৩

শেখ মুজিবের 'ভাস্কর্য' বিতর্কে বিপন্ন 'মূর্তি', শঙ্কিত সংখ্যালঘু সমাজ □ ৩৫

আঘাত প্রতিরোধকারী অভূতপূর্ব গ্লাসের প্রলেপ উদ্ভাবন
□ ড. বিপ্লব পাল □ ৩৭

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে করোনা মোকাবিলা করুন
□ ডা: পার্থসারথি মল্লিক □ ৩৯

দত্তোপন্তজী ছিলেন ভিশনারি আর্কিটেক্ট
□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৪০

নিরামিষ আহার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
□ ডা: আর এন দাস □ ৪২

ওয়েট লিফটার হওয়ার স্বপ্ন সফল হয়নি রবি ঘোষের
□ শুক্লা সিকদার □ ৪৪

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৪৭

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারত ধর্মহীন নহে, ধর্মনিষ্ঠ রাষ্ট্র

শব্দের ভুল অনুবাদের কারণে মারাত্মক ভ্রম নির্মাণ হইয়া থাকে। এই রকম একটি ভ্রম ধর্ম সম্পর্কে হইয়াছে। ধর্মের সাধারণ অর্থ হইতেছে কর্তব্য। পশ্চিমি দেশগুলিতে ধর্মের অনুরূপ কোনো শব্দই নাই। কারণ ধর্মের ভারতীয় ধারণার সহিত তাহারা পরিচিত নহে। তাহারা সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতিকে ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই জন্য রিলিজিয়নের অনুবাদ তাহারা ধর্ম করিয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবনার অনুবর্তী হইয়া ভারতে সেকুলার শব্দের অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষ করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের হিন্দি সংস্করণে সেকুলার শব্দের অনুবাদ পন্থ-নিরপেক্ষতা করা হইয়াছে। অর্থাৎ দেশের কোনো প্রকার মত, পথ, সম্প্রদায় অথবা মজহব হইবে না। পশ্চিমি দেশে এই শব্দ সরকারি শাসন-প্রশাসনে চার্চের প্রভাব কম করিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইহার সঙ্গতি নাই।

ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্মবিহীন দেশকে পাশবিক অথবা রাক্ষস মনোভাবাপন্ন মনে করা হয়। ভারতবর্ষ আবহমানকাল ধরিয়া অধ্যাত্মবোধসম্পন্ন দেশ হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত। এই দেশে কখনো কাহারও প্রতি ভেদভাব করা হয় না। এই রাষ্ট্র কখনোই কাহারও ব্যক্তিগত আস্থা অথবা বিশ্বাসে আঘাত করে নাই। বহিরাগত মত-পথকে এই দেশে মান্যতা দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানে পৃথকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের স্থান দেন নাই। তাঁহারা জানিতেন এই দেশের চরিত্রের মধ্যেই সর্বধর্ম সমভাব রহিয়াছে। স্বভাবগত ভাবে আদিকাল হইতেই এই দেশের প্রাণপাখি হইতেছে ধর্ম। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হইল, ১৯৭৫-'৭৬ সালে জরুরি অবস্থার প্রয়োগ করিয়া দেশের বিরোধী নেতৃবৃন্দকে কারাগারে বন্দি করিয়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংবিধান সংশোধনের নামে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংবিধানে অনুপ্রবেশ করাইয়াছেন। ওই সময় যাঁহারা ইহা করিয়াছেন তাঁহারা কেউই ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংবিধানে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। ফলে ভারতবর্ষ ধর্মহীন দেশে পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'ধর্মেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ'। তাই স্বাধীনতার পর বহু বৎসর সেকুলারবাদী শাসকরা কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিয়া দেশের উন্নয়ন ও বিকাশ স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল।

আসলে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা বুঝিতেই পারেন নাই যে, রাষ্ট্রেরও চরিত্র রহিয়াছে। বুঝিতে পারেন নাই যে, ধর্মই ভারতের আত্মা। বুঝিতে পারেন নাই যে, ভারতের প্রাণপাখি ধর্মেই রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাঁহারা অনুসরণ করেন নাই। স্বামীজী বলিয়াছেন— 'ধর্ম ভারতের তেজ, বীর্য, এমনকী রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল ভিত্তি। ভারত যদি ধর্ম পরিত্যাগ করে তাহা হইলে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ধর্মই ভারতবর্ষের জীবনস্বরূপ; ইহাকে দৃঢ় করিতে হইবে।' স্বামীজীর বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়া তথাকথিত সেকুলারবাদী ও প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র হিন্দুধর্মকে তাহাদের জীবন ও কর্ম হইতে বর্জন করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, বিপরীত দিকে তুষ্টিকরণের রাজনীতি করিয়া জেহাদি ও মৌলবাদী শক্তিকে পুষ্ট করিয়া দেশকে অশান্ত করিয়াছেন। স্বামীজী দেশবাসীকে সাবধান করিয়াছেন, 'এই ধর্মেই আমাদের রাষ্ট্রীয় মন, রাষ্ট্রীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্বিত হইবে। ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই রাষ্ট্রীয় জীবনপ্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে বিনাশ। তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি—সবই ধর্মের মধ্যেই করিতে হইবে।' তিনি জাতীয় নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'যদি জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তাহলে তোমাদিগকে ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসরিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিখিবার তাহা লও। কিন্তু মনে রাখিও, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে, তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব মহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সেই শুভদিন আসিতেছে; আমার বিশ্বাস—ভারত শীঘ্রই অভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইবে'।

স্বামীজী বড়োই আশাবাদী ছিলেন। তাঁহার স্বপ্ন সফল হইতে শুরু করিয়াছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭০ বৎসর পর স্বামীজীর ভাবনার অনুরূপ একজন স্বধর্মনিষ্ঠ ও দেশপ্রেমী রাজনেতা প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন। ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সুভাষিতম্

লৌকিকানাং হি সাধূনাং অর্থং বাগনুবর্ততে।

ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।।

সাধারণ সাধুদিগের বাণী অর্থকে অনুগমন করে। কিন্তু স্বয়ং অর্থ সিদ্ধপুরুষদের বাণীকে অনুসরণ করে থাকে।

আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতের কৃষি সংস্কার আইন

ড. রতন কুমার ঘোষাল

যে কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামো ও তার কার্যপ্রণালী ব্যবস্থার পরিবর্তনের নাম সংস্কার। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে কতকগুলি সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে প্রথম ১৯৫২ সালের ভূমি সংস্কার আইন। এটা কৃষি জোতের কাঠামোর পরিবর্তন আনার জন্য করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে এর সংশোধনী আইনও করা হয়েছে। এই ভূমি সংস্কার আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল— (১) জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, (২) কৃষিতে মধ্যস্বত্ব প্রথার বিলোপ সাধন, (৩) জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, (৪) সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে থাকা জমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ এবং তা ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ, (৫) ভাগ চাষিদের জমির/ভাগচাষের অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, ১৯৬৬ সালে কৃষি উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য নতুন কৃষি উৎপাদন কৌশলের প্রবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে 'সবুজ বিপ্লবের' ডাক দেওয়া হয়। এই নতুন উৎপাদন কৌশল ছিল একটি প্যাকেজ যাতে উচ্চ ফলনশীল স্বল্পমেয়াদি বীজের ব্যবহার, উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সারের ব্যবহার, কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার এবং উপযুক্ত সময়মতো সেচ ব্যবস্থা, উপযুক্ত ঋণের ব্যবস্থা ও উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি সারা ভারতে সামগ্রিকভাবে প্রচলন করে কৃষি উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা। প্রথমে পঞ্জাব হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যগুলি এই নতুন কৌশল প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা নিলেও ক্রমান্বয়ে সারা ভারতবর্ষে কৃষিতে এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়। যার ফলে ভারতীয় কৃষিতে একর পিছু ফসল উৎপাদনের এক বৈপ্লবিক বৃদ্ধি ঘটেছে। খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই কৌশল ব্যবহারের ফলে বর্তমানে সব রাজ্যেই জমির একর পিছু উৎপাদন অনেক কমে গেছে। ফলত চাষিদের চাষ থেকে লাভের দিকটাও নানা কারণে তলানিতে ঠেকেছে। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কথা সরকারিভাবে উল্লেখ করা হলেও কার্যত কিছুই করা হয়নি। এরপর ১৯৭০ দশকের শেষে কিছু রাজ্যে যেমন পশ্চিমবঙ্গের প্রজাস্বত্ব আইন, বর্গাদার আইন প্রণয়ন করা হয় ও সিলিং উদ্বৃত্ত খাসজমি ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ফলে জোতের আয়তন আরও ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়। এটা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার একটা অন্যতম কারণ। সুতরাং ভারতীয় কৃষিতে ভূমি সংস্কার আইন ও সবুজ বিপ্লব ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার আইন এ পর্যন্ত প্রণয়ন করা হয়নি। তবে কৃষি শ্রমিক ও মজুরি আইন হয়েছে ও তার কিছু কিছু সংশোধনীও হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় কৃষিতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অন্যথায় কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নতি, কৃষি পরিকাঠামোর উন্নতি, কৃষি বাজারের কাঠামোগত উন্নতি, গ্রামীণ বেকারত্ব দূরীকরণ প্রভৃতি সম্ভব নয়।

এই উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সংসদের উভয় কক্ষের যে তিনটি কৃষি বিল ধ্বনি ভোটে সমর্থিত হয়ে আইনে পরিণত হলো তার পক্ষেও যেমন জনমত আছে তেমনি বিপক্ষেও বিভিন্ন রাজ্যে যেমন পঞ্জাব হরিয়ানা কর্ণাটক পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে যে বৈপ্লবিক শোরগোল শুরু হয়েছে তা দেখে একজন অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে মনে হয় এটা নিছকই একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিরোধিতা। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ক্ষমতাসীন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সবসময় কোনো না কোনো ইস্যু বা বিষয় খুঁজে বেড়ায়। তার যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা থাক বা না থাক। এটাও সেই অপ্রাসঙ্গিক

> কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে আইন পাশ হলো সেই অনুযায়ী কৃষকরা এপিএমসি নিয়ন্ত্রিত কৃষি মান্ডিতে না গিয়ে নিজের পছন্দমতো যে কোনো ক্রেতাকে (তা বাইরে থেকে আসা পাইকারি হোক বা স্থানীয় ব্যবসাদার বা পাইকার হোক) বিক্রি করতে পারবে অর্থাৎ যেখানে সে বেশি দাম পাবে ও যারা তাকে সঙ্গে সঙ্গে তার পণ্যের দাম দেবে তাদেরই বিক্রি করবে। ফলে প্রথমত তাদের মান্ডি ফি দিতে হচ্ছে না, তাদের মান্ডির এজেন্টদের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে না এবং দ্বিতীয়ত, ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফসল বিক্রির টাকা পেয়ে উৎপদানের দাম, মহাজনের টাকা মেটাতে পারবে।

অযৌক্তিক বিরোধিতা। দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করার সুবাদে আমার মনে হচ্ছে, বিষয়টা বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা।

আসলে যে তিনটি কৃষি আইন পাস হলো— যথা : (১) কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় ও বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত আইন, (২) চাষিদের উৎপাদিত দ্রব্যের সঠিক দামের নিশ্চয়তা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি ও তাদের অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন, (৩) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সংশোধনী আইন। সেগুলি ভারতের বর্তমান কৃষি কাঠামো (বিশেষত জমি/জোতের বণ্টন কাঠামো), কৃষিকথা কৃষকদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা, গ্রামীণ বেকারত্বের অবস্থা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার, কৃষির উৎপাদন পরিকাঠামো, কৃষিপণ্যের উপযুক্ত বাজার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব, কৃষিঋণের সমস্যা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন তথা আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে খুবই সহায়ক হবে বলেই আমার মনে হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কৃষকদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে তাদের বিপথে চালিত করার চেষ্টা করছে। আসলে এই আইনগুলি বিচার করতে হলে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকার দরকার সেগুলি হলো--- (১) আইনগুলির কার্যকারিতার মধ্যে অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা, (২) সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি জমি বণ্টন কাঠামো সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা, (৩) ভারতের কৃষকদের তথা চাষের প্রকৃতি যেমন বর্গা চাষ, ভাগচাষ, লিজ চাষ, চুক্তিভিত্তিক চাষ প্রভৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা, (৪) চাষিদের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ও বিক্রিত উদ্বৃত্ত সম্পর্কে ধারণা, (৫) আঞ্চলিক শস্যচাষের ধরন সম্পর্কে ধারণা, (৬) গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও ঋণের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে ধারণা, (৭) কৃষি পরিকাঠামোর (যথা— সেচ ব্যবস্থা) বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা, (৮) কৃষি পণ্যের বাজার ও তার পরিকাঠামো সম্পর্কে ধারণা, (৯) গ্রামের রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা ও সর্বোপরি বর্তমানে কৃষকদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা ইত্যাদি। এই তিনটি কৃষি আইনের উপযোগিতা বিচার করতে হলে উপরোক্ত বিষয়গুলির একটা পরিপূর্ণ চিত্র সামনে রেখে বিচার করতে হবে। তা যদি না হয় তাহলে সেটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতা হবে। বিষয়গুলিকে অর্থনৈতিক যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে হবে। এ পর্যন্ত এই আইনের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক লেখা সংবাদমাধ্যমে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের অভাব রয়েছে এই লেখাতে আমি উল্লেখিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি আইন তিনটির অর্থনৈতিক কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করছি।

এই তিনটি আইনকে পৃথক ভাবে না দেখে, ভারতের বর্তমান কৃষি কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এক যোগে বিচার করলে দেখা যাবে ভারতীয় কৃষিতে এটা একটা উল্লেখযোগ্য সংস্কার, যা ভারতের কৃষি তথা ভারতের সার্বিক অর্থনীতিকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কৃষিতে কার্যকরী জোতের বণ্টন ব্যবস্থা :

প্রথমেই ভারতের কৃষিতে কার্যকর জোতের বণ্টনের (distribution of operational holding) কাঠামো দেখলে দেখা যায় ভারতের মোট চাষিদের মধ্যে প্রান্তিক চাষির (অর্থাৎ যাদের জমি এক হেক্টর—৭.৫ বিঘার সমান বা নীচে) গড় অনুপাত ২০১৫-১৬ সালে ছিল ৬৮ শতাংশ। এরা ভারতের মোট চাষযোগ্য জমির ২৮ শতাংশ চাষ করে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র চাষিদের (অর্থাৎ যারা এক থেকে দুই হেক্টর পর্যন্ত জমি চাষ করে) অনুপাত হলো ১৮ শতাংশ। এরা মোট চাষযোগ্য জমির ২৩ শতাংশ জমি চাষ করে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের সংখ্যার অনুপাত হলো যথাক্রমে ৮২.৮০ শতাংশ ও ১৩.৪০ শতাংশ এবং এরা পশ্চিমবঙ্গের মোট চাষ করা জমির যথাক্রমে ৫৩.৩৯ ও ২৮.৩১ শতাংশ জমি চাষ করে। এর পাশাপাশি পঞ্জাবে কার্যকরী কৃষি জোতের বণ্টন দেখলে দেখা যাবে যে এখানে দুই হেক্টরের উপরে অর্থাৎ ১৫ বিঘার বেশি জমি চাষ করে এমন চাষিদের অনুপাত প্রায় ৬৭ শতংশ যারা মোট চাষযোগ্য জমির ৯০.৩২ শতাংশ জমিতে চাষ করে। শুধু তাই নয় ৩০ বিঘার বেশি জমি চাষ করে এমন চাষিদের অনুপাত ৩৩.২৪ শতাংশ ও এরা মোট জমির ৬৫.৪৩ শতাংশ চাষ করে। সুতরাং পঞ্জাবে আধা মাঝারি, মাঝারি ও বড়ো চাষিদের ক্ষেত্রে এই কৃষি আইনের মূল সমস্যা হলো : (১) কৃষি ও কৃষিবহির্ভূত কিন্তু কৃষির সম্পর্কিত আয় (যেমন এগ্রিকালচারাল প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে আয়) প্রকাশিত হয়ে যাওয়া। কারণ নতুন আইন অনুযায়ী ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে বিক্রয় ও বাণিজ্য করতে হবে। ফলত, আয়করের জালে পড়ার সম্ভাবনা, (২) এই সমস্ত চাষিদের বাজার ব্যবস্থার উপর তথা মজুতদারির ওপর নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে, (৩) রাজ্যের কৃষি পণ্যের বাজারের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে, সেজন্যই এই বিরোধিতা।

অন্যদিকে অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িশা প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির প্রাধান্য ছাড়াও চাষযোগ্য জমির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই জোতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত। ফলত, এক একটি খণ্ডের

আয়তন এত ছোটো যে কৃষকরা চাষের আয়তন জমিত অর্থনৈতিক সুবিধা যথা উৎপাদনের ব্যয় সংকোচন ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধা পায় না। অন্যদিকে স্বাধীনতার পর থেকে ভূমি সংস্কার আইন কার্যকর হওয়াতে ও কৃষি পরিবারের বংশ পরম্পরায় বংশধরদের মধ্যে কৃষিজমির ভাগাভাগিতে জোতের আয়তন যে শুধুমাত্র ক্রমাগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়েছে তাই নয় বরং নিজ নিজ জমির সীমানা (আইল দিতে) দিতে অনেক জমি নষ্ট হচ্ছে। এছাড়াও চাষযোগ্য জমি বসবাসের জন্য ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

জোতের তথা চাষি পরিবারের প্রকৃতি :

আবার চাষি পরিবারের প্রকৃতি তথা জমির মালিকানা স্বত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গে যা খুবই প্রকট, যে বিভিন্ন ধরনের চাষি পরিবার আছে যেমন— (১) জমির মালিক নিজেই জমি চাষ করছে, (২) জমির মালিক নিজের জমি চাষ করে ও অন্যের জমি ভাগ বা ঠিকা চাষ করে, (৩) জমির মালিক কিন্তু নিজে চাষ করে না ভাগচাষিকে দেওয়া আছে ফলে ভাগচাষি জমিতে বর্গাদারী প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ বর্গাদার হিসেবে নথিভুক্ত হয়। ওই বর্গাদার বংশানুক্রমে জমি চাষ করে। এক্ষেত্রে অনেক সময় জমির মালিক বর্গাদারের সঙ্গে শর্তানুযায়ী চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্য পায় না। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায় যে জমির মালিক শহরে বসবাস করে বা অনেক জমির মালিক উচ্চবর্ণের ও গ্রামেই থাকে। সুতরাং জমির মালিক তাঁর জমি ভাগচাষিদের চাষ করতে দেয়, (৪) ঠিকা চাষপ্রথা যা বর্তমানে অত্যন্ত প্রচলিত।এই তালিকায় এমন অনেকেই আছেন যারা জমির মালিক এবং প্রান্তিক চাষি কিন্তু চাষের লাভ তলানিতে পৌঁছে যাওয়ার বা শ্রমিক সমস্যা, কৃষি উপকরণের উচ্চ দাম, চাষের ঝুঁকি বৃদ্ধি, ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়া, ঋণের সমস্যা প্রভৃতি কারণে ফসল ভিত্তিক ঠিকা চুক্তিতে কৃষি শ্রমিকদের বা অন্যান্য চাষিদের জমি চাষ করতে দেয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বহু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি ঠিকাতে তাদের জমি চাষ করতে দিচ্ছে ও অন্য পেশাতে চলে যাচ্ছে। (৫) সামান্য জমির মালিক ও একই সঙ্গে অন্যের জমি ভাগচাষ করেও কৃষিশ্রমিক হিসেবে অন্যের জমিতে কাজ করে। এটা করা হয় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে।(৬) অনেক পরিবার আছে যাদের কোনো জমির মালিকানা নেই শুধুমাত্র অন্যের জমিতে বর্গাদার হিসেবে বা ঠিকাতে চাষ করে ও সেই সঙ্গে কৃষিশ্রমিক হিসেবেও কাজ করে সংসার প্রতিপালন করে। এদের মধ্যে অনেক কৃষিশ্রমিক হিসেবেও কাজ না করে বেশি মজুরির জন্য শহরাঞ্চলে বাড়ি, ফ্ল্যাট তৈরির কাজে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হিসেবে, রংমিস্ত্রির জোগাড়ে হিসেবে কাজ করতে যায়।

পরিশেষে গ্রামে আরো এক ধরনের চাষিপরিবার আছে যাদের পরিবারের সকল সদস্য সামান্য জমি চাষের কাজে নিযুক্ত না থেকে কিছু কিছু সদস্য পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যায় ও সেখান থেকে নিজের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে উদ্বৃত্ত অর্থ বাড়িতে পাঠিয়ে নিজের পরিবারকে সাহায্য করে।

কৃষি পরিবারে আয়ের উৎস :

এই প্রসঙ্গে ভারতের কৃষিপরিবারগুলি আয়ের উৎস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতে মোট গ্রামীণ পরিবারগুলো ৫৮ শতাংশ কৃষি পরিবার। যাদের মধ্যে ৬৪.৫ শতাংশের পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হলো চাষবাস, ৩.৭ শতাংশের হলো পশুপালন, ১.১ শতাংশের অন্যান্য কৃষিকাজ ৪.৭ শতাংশ কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্র থেকেও ২২ শতাংশের প্রধান আয়ের উৎস হলো বেতন, পেনসন, আত্মীয় পরিজন কর্তৃক প্রেরিত টাকা। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে গ্রামীণ পরিবারগুলির ৪৫ শতাংশ কৃষি পরিবার যাদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ পরিবারের আয়ের উৎস হলো চাষবাস, ১.২ শতাংশ পরিবারের প্রধান আয় হলো পশুপালন থেকে, ৪.৩ শতাংশ পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হলো কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্র থেকে, ২৬.৮ শতাংশের আয়ের উৎস হলো মজুরি ও বেতন থেকে, ৬.৩ শতাংশের আয়ের উৎস হলো পেনশন ও আত্মীয়স্বজনদের প্রেরিত টাকা। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা গেছে ভারতে গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষক পরিবার চাষবাস ছেড়ে দিতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা হলো ৪৪ শতাংশ। এর প্রধান কারণ হিসেবে চাষিরা উল্লেখ করেছে, একর প্রতি উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া, ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়া, ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগসংক্রান্ত ঝুঁকি, উপযুক্ত বাজারের অভাব, কৃষি উৎপাদনের যথা— সার, কীটনাশক ওষুধ, শ্রমিক প্রভৃতির অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধি ও এর ফলস্বরূপ লাভ তলানিতে পৌঁছে যাওয়া ইত্যাদি।

এখন জোত বণ্টন কাঠামো থেকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে যে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে অতি ক্ষুদ্র চাষির অতি প্রাধান্য রয়েছে এবং এদের সিংহভাগের প্রধান আয়ের উৎস হলো কৃষি, পশুপালন ও কৃষিশ্রমিক হিসেবে মজুরি। স্বভাবতই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই চাষিদের চাষের জন্য উৎপাদন ব্যয়, ঋণ পরিশোধ ও নিজেদের ভোগের বাইরে অতিরিক্ত ফসল (ধান, গম, সরিষা, ডাল প্রভৃতি) উদ্বৃত্ত খুব কমই থাকে, যা তারা বাজারে বিক্রি করে। যেহেতু ফসল তোলার পরই তাদের উৎপাদন ব্যয় মেটাতে ও ঋণ পরিশোধ করার জন্য ফসল বিক্রি করতে হয়, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত বাজার পাওয়া, ফসলের যথাযথ দাম পাওয়া খুবই জরুরি, যা তারা গ্রামীণ ব্যবসাদার বা সরকারি সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্যে, কৃষিমান্ডি ও কৃষিপণ্য বিপণন সমিতি পরিচালিত মান্ডি প্রভৃতির কাছে বিক্রয় করে পায় না। এমনকী আমি আমার গ্রামে নিজেও দেখেছি কৃষি মান্ডি বা এপিএমসিতে ফসল বিক্রি করে চাষিরা সময়মতো টাকাও পাচ্ছে না, টাকা পেতে অনেক দেরি হচ্ছে। ফলত তারা ফসল তোলার পরেপরেই তা স্থানীয় মহাজন ও ব্যবসাদারদের কাছে অনেক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে ও লোকসান বহন করছে।এই কারণেও অনেক চাষিরা চাষ থেকে সরে যেতে চাইছে। পাঠকবর্গ এই সংক্রান্ত তথ্য জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার Situation Assessment Survey ও All India debt and Investment সমীক্ষার রিপোর্টে পাবেন।

কৃষি ঋণের উৎস :

একথা অনস্বীকার্য যে ভারতের কৃষিতে যেখানে অতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষিদের প্রাধান্য সেখানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিরা অনেকাংশেই ঋণের উপর নির্ভরশীল এবং এই ঋণের উৎস গ্রামবাংলায় দুটি — একটি হচ্ছে সংগঠিত ক্ষেত্র অর্থাৎ ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্ক, আর অন্যটি হচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্র অর্থাৎ গ্রামীণ মহাজন, ব্যবসাদার আত্মীয়পরিজন ইত্যাদি। ভারতে কৃষি ঋণের বর্তমান অবস্থা বিচার করলে দেখা যায় যে ভারতে মোট কৃষি পরিবারের (৯০.২

মিলিয়ন) মধ্যে শতকরা ৫২টি পরিবার ঋণগ্রস্থ। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুপাত হলো ৫১.৫ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশে ৯২.৯ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৮২.৫ শতাংশ, কেরলে ৭৭ শতাংশ। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা গেছে ১৯৬৯ সালের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ ঋণদানের ক্ষেত্রে সংগঠিত ক্ষেত্রের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু তারপর থেকে এ পর্যন্ত গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে বিশেষত কৃষিঋণের ক্ষেত্রে আবার অসংগঠিত ক্ষেত্রের ভূমিকা ও দৌরাত্ম্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাও দেখা গেছে যে সরকারি ক্ষেত্রে প্রদত্ত কৃষিঋণের সিংহভাগই দখল করেছে মাঝারি আধামাঝারি ও বড়ো চাষিরা। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা আগের মতোই গ্রামীণ মহাজন ব্যবসাদার সুদের কারবারী প্রভৃতিদের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা বর্তমান। সরকারি ঋণের ও অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে রাজনীতির দৌরাত্ম্যের ফলে গরিব, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা বঞ্চিত।

কৃষি বিপণন :

অন্যদিকে কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কৃষিতে বা গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য কোনো সংগঠিত বাজার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। সরকারের কৃষি বিপণন সমিতির এপিএমসি তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত কৃষি মান্ডি আছে সেগুলিও আংশিক কার্যকর। অনেক রাজ্যেই এগুলি রাজনৈতিকভাবে কুক্ষিগত করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষক উৎপাদিত দ্রব্য কৃষি মান্ডিতে বিক্রয় করে সময় মতো টাকা বা বিক্রয় মূল্য পায় না। অন্যদিকে সরকার নির্ধারিত কৃষিজাত দ্রব্যের যে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারিত হয় তা বাজার মূল্য অপেক্ষা অনেক কম। তাতে পণ্য বিক্রি করলে কৃষকদের লোকসানই হয়। ফলত কৃষকরা এপিএমসি-র উপর খুব কমই নির্ভরশীল হয় ও নগদ অর্থের প্রয়োজনে ফসল উঠলেই তারা গ্রামীণ মহাজন, ব্যবসাদারদের কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সাম্প্রতিক তথ্য দেখলে বোঝা যাবে যে ভারতের কৃষকরা সরকারি বাজার ব্যবস্থার ওপর কতটুকু নির্ভরশীল। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার Situation Assessment Survey-তে দেখা গেছে শস্য ভিত্তিক এপিএমসি-র তত্ত্বাবধানে কৃষিমান্ডিতে ফসল বিক্রির অনুপাত হলো ধানের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ, আলুর ক্ষেত্রে ১২.২ শতাংশ, কটনের ক্ষেত্রে ২২.২ শতাংশ, পাটের ক্ষেত্রে ১৯.৮ শতাংশ, আখের ক্ষেত্রে ৫.৯ শতাংশ ইত্যাদি। স্থানীয় ব্যবসাদারদের কাছে বিক্রির শতাংশ হলো : ধান (২৩.৪), আলু (৩৪.৬), কটন (৪৮.২৫), পাট (৬৮.৪), আখ (১৯.২), নারিকেল (৩৭.৯) ও বাকি অংশ কৃষি উপাদানের ব্যবসাদারদের ও অন্যান্যদের কাছে বিক্রি করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামাঞ্চলের বাজার হিসেবে স্থানীয় মহাজন, ব্যবসাদার, কৃষি উপাদানের (যথা— সার, কীটনাশক ওষুধ) ব্যবসাদারদের প্রাধান্য অনেক বেশি এর থেকে পরিষ্কার যে ভারতের কৃষকরা যেটুকু সংগঠিত বাজার আছে তার ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, ভারতের কৃষিতে স্বাধীনতার পর থেকে কৃষি পণ্যের সংগঠিত বাজার সেভাবে গড়ে ওঠেনি।

মন্তব্য :

উপরে ভারতীয় কৃষি কাঠামোর বিভিন্ন দিকের যথা— কৃষি জমি বা জোতের বণ্টন কাঠামো তথা চাষি পরিবারের প্রকৃতি, কৃষিপরিবারের আয়ের উৎস ও তার প্রকৃতি কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ও অবস্থা এবং কৃষি বিপণনের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন যদি কৃষি সংস্কার তথা কৃষকদের আয় ও উন্নতি বিধান এবং আত্মনির্ভরতার উদ্দেশ্যে যে তিনটি কৃষি আইন কার্যকর হলো তা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

প্রথমত, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে আইন পাশ হলো সেই অনুযায়ী কৃষকরা এপিএমসি নিয়ন্ত্রিত কৃষি মান্ডিতে না গিয়ে নিজের পছন্দমতো যে কোনো ক্রেতাকে (তা বাইরে থেকে আসা পাইকারি হোক বা স্থানীয় ব্যবসাদার বা পাইকার হোক) বিক্রি করতে পারবে অর্থাৎ যেখানে সে বেশি দাম পাবে ও যারা তাকে সঙ্গে সঙ্গে তার পণ্যের দাম দেবে তাদেরই বিক্রি করবে। ফলে প্রথমত তাদের মান্ডি ফি দিতে হচ্ছে না, তাদের মান্ডির এজেন্টদের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে না এবং দ্বিতীয়ত, ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফসল বিক্রির টাকা পেয়ে উৎপদানের দাম, মহাজনের টাকা মেটাতে পারবে। এছাড়া বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো আন্তঃরাজ্য পাইকারগুলির কাছে তাদের ফসল বিক্রি করতে পারলে বরং তারা সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও স্থানীয় ব্যবসাদারদের দেওয়া দামের চেয়ে বেশি দামে ফসল বেচতে পারবে। ফলে তাদের লভ্যাংশ বাড়বে ও চাষ ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতাও কমবে। এছাড়া ফসলের ওজন সংক্রান্ত কারচুপির শিকার হবে না কারণ ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে কেনাবেচা হবে। আমার প্রত্যন্ত গ্রামে আমি নিজে এখনো দেখি, যে-বছর গ্রামে বিহার থেকে বড়ো বড়ো পাইকাররা (যারা পাইকারি দামে কেনে) পেঁয়াজ কিনতে না আসে সে বছর হয় আমার চাষিবন্ধুরা পেঁয়াজ বেচতে পারছে না বা গ্রামের ব্যবসাদারদের কম দামে বাধ্য হয়ে বেচে দেয়। কারণ পেঁয়াজ, আলু প্রথমত পচনশীল ও দ্বিতীয়ত, এগুলি চাষিদের কাছে ক্যাশ crop অর্থাৎ এগুলি বেচে তারা সংসারের অন্যান্য খরচ যথা বাড়িঘর সারানো, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও পাওনাদারদের দেনা মেটায়। তাছাড়া এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কৃষিপণ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে চলাচল করলে সারা ভারত ব্যাপী কৃষিপণ্যের তথা খাদ্যদ্রব্যের দামের একটা সমতা বজায় থাকবে। প্রতিটি রাজ্যের কৃষকরা লাভবান হবে। কৃষকরা ফড়ে, দালাল ও মধ্যস্থতাকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কোনো রাজ্য পাইকার বা বড়ো কোম্পানি একচেটিয়া খাজনা উপভোগ করতে পারবে না। এতে speculation (ফাটকা) ও arbitrage (অঞ্চল ভিত্তিক দাম পার্থক্যের জন্য মুনাফা) থাকবে না। এই আইন অনুযায়ী সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও কৃষকরা পাবেন। এখন যেহেতু আমাদের দেশে অতি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের প্রাধান্য বেশি, যেহেতু সিংহভাগ কৃষি পরিবারের আয়ের উৎস চাষবাস ও ঠিকাচাষ,বর্গাচাষ, কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজের মাধ্যমে সংসারের ভরণপোষণ করা ও অধিকাংশ কৃষককে ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বীজ ও খোরাকি বাদে উদ্বৃত্ত ফসল বেচে দিতে হয়। তাহলে একথা কি বলা যায় না যে নতুন কৃষি আইনের প্রথমটি ভারতের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নয়ন, স্বনির্ভরতার পক্ষে সহায়ক হবে? মনে রাখতে হবে, ভারতের ৬৭ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে ও তাদের

সিংহভাগেরই প্রধান জীবিকা কৃষি। সুতরাং এই নতুন আইনগত সংস্কার কৃষকদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে। আমরা আগেই বলেছি ৪০ থেকে ৪৪ শতাংশ কৃষক চাষ ছেড়ে দিতে চাইছে। কৃষি পরিবারের অনেক সদস্য কৃষিকার্যের খারাপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতিতে তাদের সমস্যা ও সংখ্যা সংক্রান্ত অনেক তথ্যই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন পূর্বে আলোচিত ভারতের কৃষি কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় কৃষি আইনের কার্যকারিতা বিচার করলে দেখা যাবে এই আইন অনুযায়ী কৃষকরা নিজেরাই কারুর মাধ্যমে না গিয়ে, সরাসরি কৃষিভিত্তিক বাণিজ্যকরণ সংস্থা, কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপতি, বড়ো বড়ো পাইকারি ব্যবসাদার, রপ্তানিকারক প্রভৃতিদের সঙ্গে চাষ ও চাষ থেকে উৎপাদিত ফসল বিক্রির চুক্তি করতে পারবে এবং চুক্তির সময় ফসলের একটা লাভজনক বিক্রির দাম চুক্তিবদ্ধ করবে। এই আইন সমস্ত রাজ্যে কার্যকর হলে জাতীয় স্তরে কৃষি উৎপাদন তথা কৃষি বাজারের একটা পরিকাঠামো গড়ে উঠবে। এর ফলস্বরূপ প্রধান সুবিধা হবে নিম্নরূপ :

(১) কৃষকরা চুক্তিবদ্ধ ভাবে ফসলের লাভজনক দাম পেয়ে লাভবান হবে। বাজারের দাম উঠা-নামার উপর তাদের লাভ লোকসান নির্ভর করবে না। কারণ ফসল ওঠার ঠিক পরেপরেই গ্রামাঞ্চলের ফসলের দাম কম থাকে। দালাল বা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সেই ফসল যেমন— ধান, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি কম দামে কিনে মজুত করে ও পরে অনেক বেশি দামে বিক্রয় করে। সেই বেশি দাম পাওয়ার সুযোগ কৃষকরা ঋণগ্রস্থ হওয়ায় নিতে পারে না, ফসলও মজুত করতে পারে না। (২) কৃষকদের ঋণ পাওয়ার অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি, কৃষি উৎপাদনের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হওয়া প্রভৃতি থাকবে না। (৩) বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী সংস্থা কৃষি বিপণনে অংশগ্রহণ করার ফলে বড়ো বড়ো কৃষি প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা সরাসরি কৃষিতে প্রবেশ করার ফলে একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠবে অন্যদিকে তেমনি কৃষি পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত হবে। সামগ্রিক ভাবে ভারতের কৃষি অর্থনীতি দ্রুত উন্নতি ঘটবে ও কৃষকরা গতানুগতিক ভাবে শস্য চাষ করে থাকে যেমন— ধান, গম আলু ইত্যাদি। এগুলো ক্রমাগত চাষ হতে হতে জমির অন্তর্নিহিত উর্বরতা একেবারে কমে গেছে। ফলে একর পিছু উৎপাদনও অনেক কমেছে। এই বড়ো বড়ো সংস্থাগুলি শুধু দেশের রাজ্যের মধ্যে নয় বিদেশের বাজারেও চাহিদার ভিত্তিতে চাষিদের দিয়ে (অবশ্যই জমি মাটির গুণগত মানের ভিত্তিতে) আরো লাভজনক ফসল চাষ করাতে পারবে তাতে কৃষকদের যেমন আয়ও বাড়বে তেমনি তাদের সামাজিক মর্যাদা, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি আরও উন্নততর হবে। এই আইনে একটা কথা পরিষ্কার বলা আছে কৃষকদের জমি তাদের নিজেদেরই থাকবে। এই চুক্তি চাষ চিরকালের জন্য নয় এটা ফসলভিত্তিক হবে। প্রয়োজনে কৃষকদের স্বাধীনতা থাকবে পুনরায় চুক্তির মধ্যে আবদ্ধ না হওয়ারও। (৫) এই চুক্তি চাষের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হলো এতে মৌজাভিত্তিক সমবায় পদ্ধতিতে চাষ প্রথার সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি যে ভারতে কয়েকটি রাজ্য বাদে জোতের আয়তন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত। যার জন্য আয়তনজনিত সুবিধা পাওয়া যায় না ও আইল দিতেও প্রচুর জমি নষ্ট হয়। এই চুক্তি চাষের মাধ্যমে সমবায় চাষ পদ্ধতিও চালু করা সম্ভব হতে পারে। (৬) এতে বর্গাদার ও ভাগ চাষিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না। (৭) এই আইনে ইন্সুরেন্স ও ঋণের সঙ্গে কৃষিকার্য যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফসল নষ্ট হলে চাষিরা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচবে। (৮) আইনে আরও বলা আছে যে জমির চরিত্র পাল্টে তা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। (৯) চুক্তি সংক্রান্ত বিতর্ক উঠলে তা সমাধানের জন্য ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থার কথা এই আইনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত আছে। সুতরাং কৃষকদের তাদের জমি ও তার সত্ত্বসংক্রান্ত নিশ্চয়তা এই আইনে দেওয়া আছে।

পরিশেষে তৃতীয় আইন অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা সংশোধন করে কিছু খাদ্যদ্রব্য যেমন— চাল, ডাল, গম, ভোজ্য তেল, আলু পিঁয়াজ, তৈলবীজ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সরকরি বিধিনিষেধ ব্যতিরেকেই এগুলির ব্যবসা করা যাবে। তবে মজুদের ক্ষেত্রে কতগুলি নিয়মের কথা বলা আছে যেখানে সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে। যেমন অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থাৎ দাম যদি গত পাঁচ বছরের গড় দামকে ছাপিয়ে যায় বা দেশে যদি দুর্ভিক্ষ হয় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা যুদ্ধ লাগে তখন সরকার হস্তক্ষেপ করবে। ওই দ্রব্যগুলিকে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য থেকে বাদ দেওয়ার মূল কারণ এই যে ভারতীয় কৃষিতে যা উৎপাদন হয় তাতে আমরা বর্তমানে খাদ্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ভারতীয় কৃষিতে এগুলোই হলো প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। সেজন্য এই খাদ্য দ্রব্যগুলির ব্যবসাকে পুরোপুরি বাজারের চাহিদা ও জোগানের নিয়মের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে মানুষ কম দামে এই দ্রব্যগুলি বাজার থেকে কিনতেও পারবে। তবে কিছু ব্যতিক্রমী অবস্থা বাদে। তবুও সন্দেহ থেকে যায় যে এর ফলে স্বল্পকালে বা সাময়িকভাবে ব্যবসাদাররা অতিরিক্ত মজুত করে ফেললে বাজারে জোগানের ঘাটতির ফলে সাময়িক দাম বৃদ্ধি হতে পারে। আবার পাশাপাশি এটাও সত্যি যে এই সমস্ত কৃষিপণ্য দীর্ঘদিনের জন্য মজুত করা যায় না। যদিও ফাটকাকারবারিদের উদ্দেশ্য অতিরিক্ত মুনাফ করা। কিন্তু এই শস্যগুলির উৎপাদনের Cycle অনুযায়ী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে আবার নতুন ফসল এসে যাবে। ফলে বাজারে দাম কমে যাবে। চাষবাস কখনোই বন্ধ হবে না ও ক্রমাগত ফসল উৎপাদন হতেই থাকবে। সুতরাং জোগানের শৃঙ্খল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ প্রভৃতি ছাড়া অব্যাহত থাকবে এবং এক্ষেত্রে সরকারও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। ফলত মজুতদারির জন্য খাদ্যশস্যের অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব একটা থাকবে বলে মনে হয় না। বরং এই আইন ও প্রথম আইনটির সাহায্যে যে রাজ্য বা যে অঞ্চলে এই খাদ্যসশ্যগুলির উৎপাদন কম হয় বা ঘাটতি থাকে সেখানে মানুষ ন্যায্য দামে এই খাদ্যশস্যগুলি পাওয়ার সুবিধা পাবে। সুতরাং ভারতে সার্বিকভাবে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংম্ভরতা থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, এই তিনটি আইনকে পৃথক ভাবে না দেখে, ভারতের বর্তমান কৃষি কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এক যোগে বিচার করলে দেখা যাবে ভারতীয় কৃষিতে এটা একটা উল্লেখযোগ্য সংস্কার যা ভারতের কৃষি তথা ভারতের সার্বিক অর্থনীতিকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

(লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপক)

ধর্ম ও রিলিজন এক হতে পারে না

গৌতম কুমার মণ্ডল

ধর্ম ও রিলিজন কি এক? মোটেই এক নয়। ধর্ম শব্দের ইংরেজি তর্জমা হিসেবে রিলিজন শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় একটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ ও তার আনুষঙ্গিক ব্যঞ্জনা তর্জমাটিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম শব্দের তর্জমা রিলিজন হিসেবে ঠিক নয়। ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম আমরা বলতে পারি। কিন্তু ইসলাম বা খ্রিস্ট ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন আমরা রিলিজন-এর ব্যবহার করি, হিন্দুধর্মের প্রতিশব্দ হিসেবে যদি হিন্দু রিলিজন বলা হয় তাহলে সেখানে অপূর্ণতা থেকে যায়। আসল কথা হলো, ধর্ম ও রিলিজন এক নয়। ধর্মের অর্থ ব্যাপক। যা শুভ বুদ্ধি ও সৎ চিন্তা ধারণ করে রাখে তা-ই ধর্ম। আর রিলিজিয়ন হলো উপাসনা পদ্ধতিমাত্র।

যিশুখ্রিস্টের জন্মের সময় থেকে স্ত্রিীয় ক্যালেন্ডার শুরু হয়। ইসলামের আক্রমণ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষ দিকে। কিন্তু নিজ 'ইজম্' বা রীতিনীতির কিছু পৃথক নিয়ম তারা বজায় রাখল। এ দেশের বহু মানুষ তাদের নতুন জীবনপ্রণালী গ্রহণ করল। নইলে তারা আর ক'জন এসেছিল? খ্রিস্টীয় ১১০০-এর পর থেকে ইসলামি যোদ্ধারা এদেশের ছোটো বড়ো রাজ্যের রাজা হয়ে উঠল। অস্ত্র আর যুদ্ধের নিষ্ঠুরতায় তাদের রাজ্য দখল করতে থাকল। তাদের জীবনাচরণ ও ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিন্ন পথকে এদেশের বহু মানুষ ভয়ে-ভক্তিতে গ্রহণ করল। তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ল। ফলে একদিন যারা ছিল হিন্দু তারা হয়ে গেল মুসলমান । বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে (বাংলার নবজাগৃতি : বিনয় ঘোষ; ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৯)।

হিন্দুধর্ম আসলে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা একটি জীবনাচরণের নাম। এই জীবনাচরণের মধ্যেই তাঁরা ঈশ্বরকে খুঁজলেন। বহু মানুষ এখানে। কিন্তু সকলের ঈশ্বর অনুসন্ধানের পথ একরকম হলো না। জন্ম নিল দ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ —এমনই আরও কত কী! বহু পথ, কিন্তু উদ্দেশ্য একই। তাই একথা বলা হয়ে থাকে যে, 'হিন্দুধর্ম সবরকম আধ্যাত্মিক পরীক্ষা নিরীক্ষার এক বিপুল ভাণ্ডার'। এই বিশাল দেশে নিজেদের বোধ আর মননকে কাজে লাগিয়ে, কখনো বা তপোবনের নিভৃত অন্তরালে বসে সারা বিশ্বকে তাঁরা অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন— 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। নিভৃতে বসেই তাঁরা নিজেদের খুঁজেছেন। একই সঙ্গে আত্মানুসন্ধান ও ঈশ্বরানুসন্ধান। এঁদের মত-পথ-উপাসনার বিভিন্ন নিয়ম বহু মানুষ মেনে চলেছেন। এঁরা সবাই হিন্দু। এঁদের অভ্যস্ত পথ হিন্দুধর্ম। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) হিন্দুধর্মের একজন স্বনামধন্য আলোচক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিন্দুধর্ম'। গ্রন্থটি ইংরেজিতে লেখা। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একজন পণ্ডিত মানুষ। এই গ্রন্থে হিন্দু ধর্মের মূল কথাগুলি বড়ো সহজ সরল ও সুন্দর ভাষায় আলোচিত হয়েছে। এই বিখ্যাত গ্রন্থে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন জানিয়েছেন— 'ধর্ম ও রিলিজন এক জিনিস নয়। হিন্দু ধর্মকে নির্দিষ্ট অর্থে রিলিজন বলা যাবে না। এ ধর্মই'। এ গ্রন্থেই অন্যত্র তিনি জানিয়েছেন 'হিন্দুধর্ম বিষয়ে যাঁরা লেখেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানাতে বাধ্য হন যে 'ধর্ম' ও 'রিলিজন' এক জিনিস নয়, 'মন্দির' হিন্দু 'গির্জা' নয়, 'জাতি'র তর্জমা করা হয়েছে 'কাস্ট' কিন্তু তর্জমাটি লাগসই নয় আদৌ।

> **শঙ্করাচার্যের হাত ধরেই হিন্দুরা ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা পায়। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুসমাজ জাতিভেদ প্রথায় এমনিতেই অনেক দুর্বল ছিল। ক্রমশ এই দুর্বল হিন্দুসমাজ এক একটি মঠকে কেন্দ্র করে সংগঠিত রূপ লাভ করল। ধর্ম যেন রিলিজিনের বলে বলীয়ান হয়ে উঠল।**

ধর্ম কোনো কিছুর আচরণকে প্রতিফলিত করে। যেমন জলের ধর্ম নিম্নগামী হওয়া। লোহার ধর্ম তাপের প্রভাবে নরম হয়ে যাওয়া। কর্পূরের ধর্ম বাতাসে উবে যাওয়া। তেমনি সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-কৃষ্ণা-কাবেরী নদী অধ্যুষিত এই বিরাট দেশের মানুষের ধর্ম কী? জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা, সেবা, জীবে প্রেম, জল-জঙ্গল-মাটির প্রতি মমত্ববোধ, ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও বিশ্বাস— এইসব মেনে চলাই এই হিন্দুর ধর্ম। সিন্ধু থেকে জাত হিন্দু। তাঁরা এই দেশে বাস করেন আর এসব কিছু মেনে চলেন। এদের ধর্মকে ক্ষিতিমোহন বলেছেন 'ভারতীয় ধর্ম'। A.C. Bouquet-র উদ্ধৃতি

আহরণ করে ক্ষিতিমোহন জানিয়েছেন, 'ভারতীয় ধর্ম সবসময়েই অতিথিপরায়ণ, সহিষ্ণু ও সমন্বয়ী। সেই কারণে আজকের এই হিন্দুধর্মের মধ্যে বিশ্বাস ও আচরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় অবিশ্বাস্য সহিষ্ণুতা।'

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও হিন্দুধর্মের একজন বড়ো তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। 'দ্য হিন্দু ভিউ অব লাইফ' গ্রন্থে তিনি প্রায় একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে, 'চিন্তার রাজ্যে এ আমাদের অবাধ স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু আচরণবিধিতে কঠোরতা আরোপ করে। আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী— সবাই হিন্দু হতে পারে হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবনের সুসম্বন্ধ ব্যবস্থাটিকে স্বীকার করে নিলেই। বিশ্বাস নয়, নৈতিক আচরণই শুধু বিবেচ্য'। আচরণটি বড়ো, বিশ্বাস নয়। আমরা আমাদের জীবনে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত কী আচরণ করি তার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় আমাদের ধর্ম। আমরা কী বিশ্বাস করি তা দিয়ে ধর্ম গড়ে ওঠে না। তাই বলা হয় হিন্দু ওয়ে অব লাইফ— হিন্দু জীবন প্রণালী।

'ধর্ম' এমনই একটি শব্দ যার ঠিক ইংরেজি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। রিলিজন বলতে যা বোঝায় 'ধর্ম' তা নয়। রিলিজন হলো ঈশ্বর বিশ্বাসের বা ঈশ্বর অন্বেষণের এক একটি ধারার নাম। এই বিশ্বাস থেকে যাঁরা সেই অনুযায়ী জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন তাঁরা সেই রিলিজনের মানুষ। এদিক দিয়ে খ্রিস্টানিটি বা মোহামেডান এক একটি রিলিজন। কিন্তু হিন্দু সে অর্থে রিলিজন নয়। এখানে একটি নির্দিষ্ট পথের অনুসারী মানুষ নেই। ঈশ্বর অন্বেষণের বহু পথের বহু মানুষের বিচিত্র সমাবেশ এখানে। এমনকী তাঁদের অনেকে ঈশ্বরে পুরোপুরি অবিশ্বাস করে থাকেন। তাঁরা চূড়ান্ত নাস্তিক। কিন্তু এঁদেরও হিন্দু হতে কোনো বাধা নেই। ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, জীবনাচরণ এখানে বড়ো। বড়ো জীবন যাপনের বৈচিত্র্য ও সহিষ্ণুতা। হিন্দুরা নানা পথে বিশ্বাস করেন, একপথে নয়। একপথে বিশ্বাসীদের রিলিজন বলা যেতে পারে। বহুপথের জীবনাচরণে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা হিন্দুধর্মের মানুষ। রিলিজনে বিশ্বাসটাই বড়ো। কিন্তু ধর্মে বিশ্বাস বড়ো নয়। তাই ঈশ্বরে অবিশ্বাসীও হিন্দুধর্মের মানুষ হতে পারেন। কেউ তাঁকে অবহেলা বা অপাংক্তেয় করে রাখতে পারবে না। কিন্তু গড বা খোদাতালার প্রতি চূড়ান্ত অবিশ্বাস করে কেউ খ্রিস্টান বা মুসলমান হতে পারেন না। আল্লার প্রতি অবিশ্বাস তো ইসলামে চূড়ান্ত পাপ বলেই গণ্য হয়।

হিন্দুধর্মের মানুষ সাধারণভাবে প্রতিমার মাধ্যমে ঈশ্বরকে খোঁজেন। অনেকেই হিন্দুদের প্রতিমা পূজা এবং বহুদেববাদের বিরোধিতা করেন। বিশেষ করে উনিশ শতকের ব্রাহ্মরা, তারও আগে মুসলমান ও খ্রিস্টানেরা হিন্দুদের এই মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেছেন। কেউ কেউ ব্যঙ্গও করেছেন। কোনো কোনো ক্ষমতাধর শাসক হিন্দুদের পূজার মূর্তি ভেঙে দিয়েছেন। প্রতিমা পূজা যেহেতু হিন্দুধর্মের একটি মূল অনুভব তাই তাকে নানাভাবে আঘাত করে তার থেকে আলাদা হতে চেয়েছে অন্য রিলিজনের মানুষেরা। কিন্তু হিন্দুরা প্রতিমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিরূপ দেখেন। ইন্দ্রিয়ের অগম্য ঈশ্বরকে কিছুটা ধরাছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে আসেন। এটাও তাঁদের দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত আচরণমাত্র, অন্য কিছু নয়। অন্তত বিশ্বাস তো নয়ই। হিন্দুরা সরস্বতীর পূজা করেন ভক্তিভরে। কিন্তু তাঁরা কেউ বিশ্বাস করেন না সরস্বতী নামের এক শ্বেতবসনা দেবী হাঁসের পিঠে চেপে স্বর্গে বসে বীণা বাজাচ্ছেন। এই বিষয়টির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে 'হিন্দুধর্ম' গ্রন্থটিতে। সপ্তদশ শতকের ফরাসি পর্যটক ফ্রাঙ্কাইস বার্নিয়ার-এর সঙ্গে বারাণসীর কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিতের এক পুরোনো তর্ক উদ্ধার করেছেন ক্ষিতিমোহন। পণ্ডিতদের কাছে বার্নিয়ের বলেছিলেন হিন্দুদের প্রতিমাপূজার নিরর্থকতার কথা। উত্তরে পণ্ডিতেরা যা বলেছিলেন তা এরকম— 'সত্যি, আমাদের মন্দিরে নানা রকমের প্রতিমা আছে। এইসব প্রতিমার প্রতি আমরা প্রভূত ভক্তি নিবেদন করি আভূমি প্রণত হয়ে, সাড়ম্বরে ফুল, তণ্ডুল, সুগন্ধি তেল, চন্দন ওইরকম আরও নানান সামগ্রী দিয়ে। তবু এই প্রতিমাগুলিই ব্রহ্মা বা বিষ্ণু এমন বিশ্বাস আমাদের নেই।' বিশ্বাস নেই কিন্তু ভক্তি আছে। এটা হিন্দুধর্মেই সম্ভব কোনো রিলিজনে নয়।

হিন্দুদের প্রতিমাপূজা বা তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতিকে বোঝার জন্য খানিকটা কল্পনাশক্তির দরকার। যে কোনো প্রতিমাই এক একটি প্রতীককে রূপ দিতে চায়। যেমন মহিসাযুরমর্দিনী দুর্গার প্রতিমায় অশুভ শক্তির বিনাশের ভাবনাটি আছে। লক্ষ্মীদেবীর কল্পিত রূপে আছে ধনলাভ ও ধনরক্ষার প্রতীক। এই প্রতীকগুলিকে বুঝতে হলে কল্পনাপ্রবণ মন না হলে হয় না। তাই বিদেশিরা অনেক সময় হিন্দুধর্মের নানান আচার আচরণগুলিকে ঠিকমতো বুঝতে পারেন না। কারণ তাঁরা রিলিজনের মানুষ— ধর্মের ভিতরে ঠিকভাবে প্রবেশ করতে পারেন না।

জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন 'What is Religion'। গান্ধীজীর মতো নেহরুও স্বীকার করেছেন ভারত হলো আদতে একটি ধর্মীয় দেশ। এদেশের মানুষ ধর্মভীরু। ধর্মীয় ভারতের কথা বলতে গিয়েই নেহরু বলেছেন 'Organised Rligion'-র কথা। এর ক্ষমতা কত তা আমাদের দেখিয়েছেন ইংলন্ডের চার্চ ও তার আমাদের দেশের অধিপতিরা। নেহরু লিখেছেন, 'The church of England is perhaps the most abvious example of a religion which is not a religion in any sense of the word।' এই চার্চের রিলিজিয়নের ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে যেন কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা ছিলেন ক্ষমতাধর। সংগঠিত। কিন্তু ভারতীয় চেতনায় ধর্মচিন্তার মূল ভাবনাগুলি ছিল ঈশ্বরবিশ্বাস, সত্য ও অহিংসা, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা,বিনয়, জীবে প্রেম, সদ্‌ভাবনা— এইসব। তাঁর রাজনীতি এগুলি বাদ দিয়ে নয়। গান্ধীজী জানিয়েছেন— 'My devotion to truth has drawn me into the field of politics, and I can say without slightest hesitation, and yet in all humility, that those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means।' গান্ধীজী যখন এই religion-র কথা বলছেন তখন তিনি ধর্মের কথাই বলছেন।

ভারতবর্ষে আর একটি মূল রিলিজিন হলো ইসলাম। তারাও অত্যন্ত সংগঠিত। মুসলমান রাজশক্তি বারবার নিজেদের ধর্মের প্রচার এবং প্রসারে মূল উদ্যোগ নিয়েছেন। ধর্মের প্রসারের জন্যই ইসলামি শাসকেরা একের পর এক মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়েছেন। মন্দির ও তার দেবমূর্তিতে আঘাত করতে পারলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের মনে ভয় ধরানো যেত। ধর্মভীরু হিন্দুদের বশ্যতা আদায়ের এটা ছিল সহজ পথ। এই 'Organised Rligion'-এ তা খ্রিস্টান বা ইসলাম যাই হোক না কেন সেখানে ঈশ্বরভাবনা তা আত্মানুসন্ধানের বিষয়টি— যা ধর্মের মূল কথা— তা অনেকাংশে ফিকে হয়ে যায়।

হিন্দুধর্ম চিরদিনই অসংগঠিত, এলোমেলো। একে খানিকটা সংগঠিত রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন অষ্টম শতকের দক্ষিণ ভারতীয় তাত্ত্বিক শংকরাচার্য। বহু ঈশ্বরবাদ নয়, তিনি নিয়ে এলেন অদ্বৈতবাদের বাণী— যা হিন্দুদের ক্ষেত্রে একেবারেই নতুন। বিনয় ঘোষ অনুমান করেছেন শঙ্করাচার্যের এই অদ্বৈতবাদের ভাবনা আসলে ইসলামের একেশ্বরবাদেরই ফল। দক্ষিণ ভারতে বহিরাগত আর নবজীবনে বলীয়ান ইসলামের সঙ্গে সংঘাতে প্রথমেই এভাবে আপোশের রাস্তায় হেঁটেছেন শঙ্করাচার্য এবং জয় পেয়েছেন। সারা ভারতে তিনি অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন, জানিয়েছেন এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি। জগৎ মায়াময়। এই ভাবনায় শঙ্করাচার্যের হাত ধরেই হিন্দুরা যেন ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা পেল। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুসমাজ জাতিভেদ প্রথায় এমনিতেই অনেক দুর্বল ছিল। ক্রমশ এই দুর্বল হিন্দুসমাজ এক একটি মঠকে কেন্দ্র করে সংগঠিত রূপ লাভ করল। ধর্ম যেন রিলিজিনের বলে বলীয়ান হতে থাকল। তবে হিন্দুধর্মের মূল শক্তি তার সহিষ্ণুতা, তার সমন্বয়ী মনোভাব, উদারতা। সেসব কিছুকে গ্রহণ করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ এই হিন্দুধর্মেরই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রবক্তা। বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুধর্মকে বড়ো আপন করে নিয়েছিলেন, বড়ো ভালোবেসেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়া বৌদ্ধ ধর্মকে তিনি আলাদা কোনো ধর্মমত হিসেবে মনেই করতেন না। তাঁর মতে বৌদ্ধ হিন্দুধর্মের বাইরের বা বিরোধী কোনো পৃথক ধর্মমত নয়। বিষয়টি পরে আলোচনা করা যেতে পারে। ❑

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name : **AXIS Bank Ltd.**

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত সংজ্ঞা ও বর্তমান ভারত

‘সেকুলারিজম’ নামক তত্ত্বকে সামনে রেখে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-জনসাধারণকে হিন্দুধর্মের শিক্ষা-সংস্কৃতি, পরম্পরা, ঐতিহ্য, মহিমা এবং সর্বোপরি শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া বা বলা ভালো, হিন্দুদের অধঃপতিত করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।

রামানুজ গোস্বামী

‘‘ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। তুমি কখনও ইহা পরিবর্তন করিতে পার না। ...সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে; ...শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের পরিবেশ ধর্মের মহান আদর্শে পূর্ণ রহিয়াছে। ...এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। ...এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।’’ (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫/৬৭)

ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতির প্রচেষ্টা তথা দেশ ও সমাজ গঠনের প্রয়াস যে ভারতবর্ষে এক অবান্তর প্রস্তাব— তা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারি। প্রতিটি দেশ তথা প্রত্যেক সমাজের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। সুপ্রাচীন অতীতকাল থেকেই সেই বৈশিষ্ট্যের বা সেই মতাদর্শের অনুসরণ করেই সেই দেশ বা সেই সমাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। সুদূর অতীতে বেদ-বেদান্তের যুগ থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বা তারও পরবর্তীকালের গতিপ্রকৃতি যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি, তবে এটাই দেখা যাবে যে, চিরকালই এদেশে সর্বাধিক প্রাধান্য বা মর্যাদা লাভ করে এসেছে একটি ধারণা বা তত্ত্ব— তা হলো ধর্মভাবনা বা ধর্মতত্ত্ব। এই কারণেই ভারতে মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, শাস্ত্রবিশারদ তথা ধার্মিক ব্যক্তিদের স্থান ছিল চিরকালই সবার থেকে উঁচুতে। এমনকী দেশের শাসকেরাও তাঁদের পরম শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন। সমস্ত বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ বা তার পরও এই ধারা ছিল প্রবহমান। এখন প্রশ্ন এটাই যে, ভারতের ধর্মভাবনা বলতে কোন্ ধর্মের কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছেন? এই প্রশ্নটি তোলার কারণ ভারতে বহু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির বাস এবং তা যে শুধুমাত্র এই সময়েই, এমনটা নয়— বহু শতাব্দী ধরেই এইসব ধর্মের মানুষেরা এই দেশে বাস করেন। এদের মধ্যে রয়েছে ভারতে উদ্ভূত জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিখ ধর্ম এবং ইসলাম মতাবলম্বী (এরা ভারতের বাইরে থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই এই দেশে এসেছিল) ও খ্রিস্টধর্ম (এরাও ভারতের বাইরে থেকে এই দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্যই এসেছিল) । এই সকল ধর্মের বাইরে থাকা ভারতের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী, তারা হলেন হিন্দু। এই হিন্দুরাই ভারত বা ভারতভূমির সনাতন অধিবাসী ও সনাতন ধর্মাবলম্বী। এই জগতের প্রাচীনতম হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মেরই ইতিহাস মাত্র কয়েকশত বছর বা দুই-তিন হাজার বছরের প্রাচীন। কিন্তু হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্মের ইতিহাস অন্তত দশ হাজার বছরের প্রাচীন (বেশি ছাড়া কম নয়)। সুতরাং, এটা তো বলাই যায় যে, স্বামীজীর এই সকল উক্তির লক্ষ্য হিন্দুরাই। এই বিষয়ে আরও একটি স্পষ্ট উক্তির উল্লেখ করি—

‘‘সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর— ইহাই ভারতীয় জীবনসাধনার মূলমন্ত্র। ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ড স্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।’’ (৫/৩৭৬)

সুতরাং, বোঝাই যায় যে, স্বামীজী হিন্দুদের উদ্দেশ্য করেই এই কথাগুলি বলেছিলেন। তাই এই কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, ভারতীয় সভ্যতা হলো সম্পূর্ণ রূপেই হিন্দু সভ্যতা এবং ভারত চিরদিনই ‘হিন্দুরাষ্ট্র’। পরবর্তীকালে বৈদেশিক মুসলমান ও খ্রিস্টানেরা এদেশে এসে দেশের শাসক হয়ে বসে ও বহু নিরীহ, নিরপরাধ নরনারীকে মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে। এটা সম্পূর্ণ ভয় দেখিয়েই এরা করেছিল এবং প্রাণভয়ে ভীত হয়ে বহু হিন্দু বিধর্মীর ধর্মগ্রহণে বাধ্য হয়। এই সময়ে হিন্দু মঠ-মন্দির লুণ্ঠন, অপবিত্র করা, ধ্বংস করা, হিন্দুদের হত্যা করা, সম্পত্তি লুণ্ঠন, হিন্দু

নারীদের সম্মান- লুণ্ঠন ইত্যাদি ছিল এই সকল বিধর্মীদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। এত কিছুর পরেও বহু হিন্দু ধর্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং অনেকে তো বিধর্মীর কাছে মাথা নত না করে স্বেচ্ছায় হাসিমুখে মৃত্যুবরণও করেছিলেন। বীরত্ব ও ত্যাগের কারণেই আজও মহারাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ বীর ও বীরাঙ্গনা স্মরণীয় ও বরণীয়। এই সকল ব্যাপারে স্বামীজী ও অন্যান্য বহু মনীষীর বক্তব্য নানা সময়ে আলোচনা করেছি। তাই প্রবন্ধে স্থানাভাব হেতু এক্ষেত্রে আর উল্লেখ করছি না। বস্তুত, যে সকল ব্যক্তি স্বামীজীর রচনাবলী অধ্যয়ন করেছেন, তারা এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, হিন্দুধর্মকে তিনি 'সর্বশ্রেষ্ঠ' ধর্মের শিরোপা দিয়েছিলেন এবং নিজে হিন্দুধর্মাবলম্বী বলে গর্ব বোধ করতেন। শুধু তাই নয়, এই ভারতভূমির প্রকৃত উন্নতি যে একমাত্র হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসারের দ্বারাই করা সম্ভব, তা তো তাঁর কথা থেকে একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যায়। হিন্দুধর্মই ভারতের প্রাণশক্তি বা চালিকাশক্তি এবং অন্যান্য জাতি বা ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার পিছনে এই ধর্মের শক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তিই যে হিন্দুকে সহায়তা করেছে— এটাও স্বামীজী বহু ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই এই প্রশ্ন তো এসেই যায় যে, যদি কেউ সুপরিকল্পিত ভাবে হিন্দুদের বিনাশ করতে চায়, তাহলে সে কী করবে? সে কী হিন্দুদের বিরুদ্ধে তরবারি বা বন্দুক তুলে ধরবে না কী সে সুকৌশলে হিন্দুসমাজকে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্যুত করবে? ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, ধর্মচ্যুত হলেই হিন্দুর বিনাশ অবধারিত। তাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বা সরাসরি বললে বলতে হয় যে, স্বাধীন ভারতে এটাই করা হয়েছিল।

স্বাধীন ভারত অখণ্ড ভারত নয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভকে কেন্দ্র করে কলকাতা-সহ অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামি দস্যু, দাঙ্গাবাজ ও পাষণ্ডের দল দ্বারা হিন্দুসংহার ঘটেছিল, তা আমাদের সকলেরই জানা। ভগবানের আশীর্বাদে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্বরূপ হিন্দু বাঙ্গালি আজ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারছে। কিন্তু দেশ তিন ভাগে বিভক্ত হওয়ার পরও হিন্দুদের দুরবস্থা কমেনি। এই প্রবন্ধের শিরোনামের অনুসরণে বলা যায় যে, এর পিছনে যদিও একাধিক কারণ কাজ করেছে, তবুও এটা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানের একটি বিশেষ শব্দ এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে দায়ী। তা হলো— 'সেকুলার' বা ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু সেকুলার শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী ধর্মনিরপেক্ষতা না কি অন্য কিছু?

প্রকৃতপক্ষে সেকুলার শব্দ দ্বারা তোলাই ছিল কংগ্রেসী শাসকদের লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, স্বাধীনতার পর থেকেই কি দেশের সংবিধানে ভারতকে সেকুলার বলে অভিহিত করা হয়েছিল? উত্তর হলো— 'না'। এই শব্দটির সংযোজন হয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন দশক পরে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে। অকস্মাৎ জরুরি অবস্থা সারাদেশে জারি করা যেমন ইন্দিরা গান্ধীর এক অত্যন্ত নিম্ন মতাদর্শের পরিচয় দেয়, তেমনই দেশের সংবিধান বদল করে তাকে ধর্মের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন করে দেওয়াটাও অত্যন্ত সংকীর্ণ ভোট-রাজনীতি

ভারতীয় সভ্যতা সম্পূর্ণ রূপেই হিন্দু সভ্যতা এবং ভারত চিরদিনই 'হিন্দুরাষ্ট্র'। পরবর্তীকালে বৈদেশিক মুসলমান ও খ্রিস্টানেরা এদেশে এসে দেশের শাসক হয়ে বসে এবং ভয় দেখিয়ে বহু নিরীহ, নিরপরাধ নরনারীকে মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে।

ধর্মবর্জিত এক শাসনতন্ত্রের পত্তনই করা হয়েছিল। নিরপেক্ষতার প্রশ্নই এক্ষেত্রে অবান্তর। 'বর্জন' শব্দটি বললে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মনে আঘাত লাগতে পারে, ফলে কিছু হলেও ভোট হারাবার আশঙ্কা তো থেকেই যায়। এই কারণেই 'বর্জন' শব্দের বদলে 'নিরপেক্ষ' কথাটি জুড়ে একে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। দেশের সরকারি ক্ষেত্র, সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশাসনিক ক্ষেত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই ধর্মের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক থাকবে না বলেই ভারতবর্ষকে একটি সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। বস্তুত, এই সেকুলার শব্দটি ইউরোপিয়ান প্রোটেস্ট্যান্ট ভাবাদর্শের অনুসারী, যেখানে দেশের শাসক ধর্মীয় যে কোনও বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে না। অর্থাৎ ধর্মবর্জিত শাসনব্যবস্থা গড়ে ছাড়া অন্য আর কিছু ছিল না। বোঝাই যায় যে, এর ফলে হাজার হাজার বছর ধরে ভারত যে 'ধর্ম' নামক বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, দেশের জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনবোধ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা প্রভৃতি সব কিছুই যে ব্যাপারটিকে আঁকড়ে ধরে চলেছিল, তার মূলে কুঠারাঘাতের চেষ্টা করা হয়। এর পিছনে ছিল এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজম নামক তত্ত্বকে সামনে রেখে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-জনসাধারণকে হিন্দুধর্মের শিক্ষা-সংস্কৃতি, পরম্পরা, ঐতিহ্য, মহিমা এবং সর্বোপরি শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া বা বলা ভালো যে, হিন্দুদের অধঃপতিত করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। পরবর্তী সংখ্যায় এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

ছত্রপতি শিবাজী রেল স্টেশন, মুম্বাই (২০০৮)

কারা সারা বিশ্বকে রক্তরঞ্জিত করে চলেছে?

নবি মহম্মদ আরবে নানা সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে অবিরত মারদাঙ্গা বন্ধ করার জন্য যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা কিন্তু সফল হয়নি। তাঁর অনুসারীরা যেমন অন্যদের খতম করার লক্ষ্যে অবিরত লড়াই করে চলেছে তেমনি নিজেদের মধ্যেও লড়াই করে চলেছে। সারা বিশ্বকে তারা রক্তরঞ্জিত করে চলেছে।

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই বলে থাকেন ইসলাম সন্ত্রাসবাদে সমর্থন দেয় না। তাঁদের বক্তব্য : 'মধ্যপন্থা এবং সামাজিক সমঝোতা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রায় সকলেই জানি, মধ্যমপন্থার সঙ্গে উগ্রবাদের বিরোধ তীব্র। উগ্রবাদ সমাজের সমর্থন বা অনুমোদনের তোয়াক্কা করে না। অস্ত্র, হামলা ও রক্তক্ষয়কে সে তার লক্ষ্য অর্জনের রাস্তা হিসেবে বেছে নেয়। এখান থেকেই শুরু হয় সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ ও লড়াই। ইসলাম সমাজকে গড়ে তোলে। তার তোয়াক্কা করে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে নিয়ে সে চিন্তিত। যে কোনো বিরোধেই ইসলাম দাবি করে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা।' দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এই ধরনের মন্তব্য বিভ্রান্তিকর এবং প্রমাদে পূর্ণ। ইসলামে মধ্যপন্থার স্থান নেই। মুসলমানদের অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ তথা ইসলামি আইন শাস্ত্রের উল্লেখ না করে শুধুমাত্র তাঁদের একমেব ধর্মগ্রন্থ যার উপর ভিত্তি করে ইসলামি চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছে সেই কোরানের প্রতিটি স্তবক উদ্ধৃতি-সহ বিশ্লেষণ করলে এই সত্য প্রমাণিত হবে অর্থাৎ বোঝা যাবে যে ইসলাম আগাগোড়া সন্ত্রাসে প্রশ্রয় দেয়। না হলে যাঁরা কোরানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান— কোরানের নির্দেশ ছাড়া এক পা-ও এগোতে চান না তাঁরা কেন এত মারমুখী হবেন? সত্যি কথা বলতে কী

‘ধর্মপ্রাণ’ মুসলমান বন্ধুরা যাই বলুন ইসলাম আর সন্ত্রাস সমার্থক।

পবিত্র কোরান প্রথম থেকেই মানব জাতিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে— বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, যারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আর যারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বা একেবারে নাস্তিক। হিন্দুশাস্ত্র বা খ্রিস্টধর্ম কে বহু ঈশ্বরবাদী এমনকী কে একেবারে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী এই নিয়ে মাথা ঘামায় না। বৌদ্ধধর্ম তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে ভগবান নেই। এমনকী চার্বাক মতবাদ তো ঈশ্বরবাদীদের নিয়ে যারপরনাই ঠাট্টা করেছে— মর্মান্তিক ঠাট্টা। কিন্তু হিন্দুরা এই নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্যপক্ষে কোরান বলছেন, আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়। (২।১৬৩) কিন্তু যারা আল্লার প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করেন তাদের উপর পড়বে ঈশ্বর, দেবদূত তথা সমস্ত মানবজাতির অভিশাপ। তাদের শাস্তি কখনও লাঘব হবে না। (২।১৬১-২)। এই শাস্তি কে দেবে? বলা বাহুল্য এক ঈশ্বরবিশ্বাসী মুসলমানরা— অন্য অর্থে মৌলবাদী হতে বাধ্য। যারা মুসলমান নয়— তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে (২।১৬৬)। শুধু তাই নয়, তাদের যেখানে পাবে ‘ধরে হত্যা’ করতে হবে। (২।১১, ৯।৫) যারা বিশ্বাসের বিরোধী

আমেরিকার বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র।

ব্রিটেন, ২২ মার্চ - ২০১৭।

জার্মানি (ফেব্রুয়ারি, ২০২০)।

অর্থাৎ ইসলামের বিরোধী তাদের পুরস্কার হলো এই। (২।১৭) এই সুরাগুলি কী স্পষ্ট করে উগ্রবাদ যা সন্ত্রাসবাদের নির্দেশ দিচ্ছে না? ইসলামে ক্ষমা নেই, মধ্যপন্থা নেই--- আছে একটাই পথ অমুসলমানদের ধরো আর মারো।

কোরান অমুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বলছেন, ‘অবিশ্বাসীদের কথা শুনো না, উপরন্তু ওদের সঙ্গে সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করো।’ (১৯।৫২; ২৮।৯) ‘যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের প্রতি আনুগত্য জানাও তাহলে তারা তোমাদের বিতড়িত করবে এবং তোমরা তোমাদের বিশ্বাস হারাবে।’ (৪।১৪৯) মোট কথা বিধর্মীদের সঙ্গে সহবাস করবে না— আরও পরিষ্কার করে বলতে হয় বিধর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখবে। এই দূরত্ব বজায় রক্ষা করার জন্য শক্ত হতে হবে (৪।১৪৭), ভয় সৃষ্টি করতে হবে (৪।১৫১)। অর্থাৎ সন্ত্রাসী হতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইসলাম শান্তির কথা বলে না, বলে বিধর্মীদের সঙ্গে একত্রে তো থাকা চলবেই না, তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তাই বিশ্বনবি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে খ্রিস্টান ও

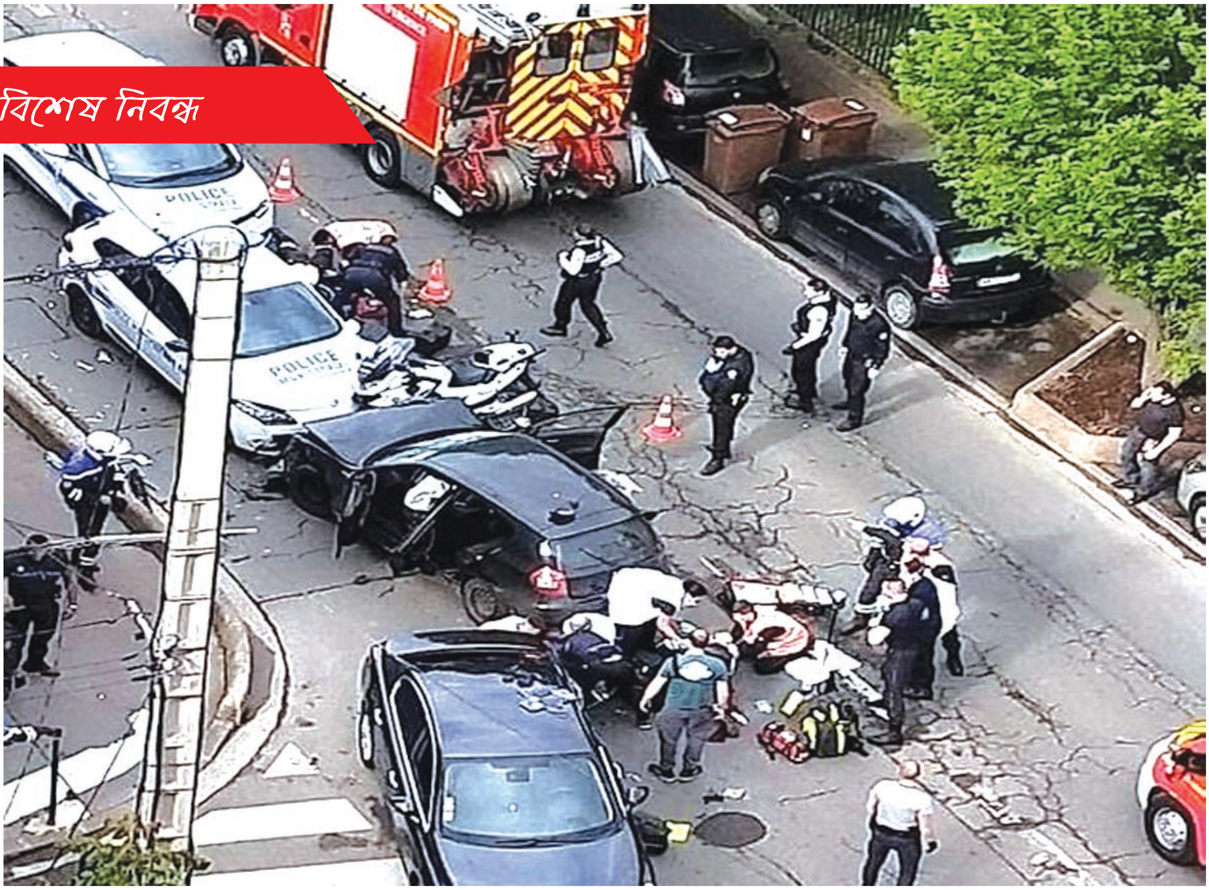

ফ্রান্স।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ করেছেন। কথিত আছে তিনি একাই ছ'শো ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন। কারোর প্রতি দয়া দেখিয়ে অব্যাহতি দেননি। তাঁর উদাহরণ অনুসরণ মুসলমান সুলতানরা তাঁদের অধীনে নানা দেশে শত শত অমুসলমানদের হত্যা করেছেন। খলিফারা ১৮৯৫-৯৬ সালে ১ থেকে ৩ লক্ষ আমেরিকান এবং ১৯১৫ সালে ১৫ লক্ষ আর্মেনিয়ানকে হত্যা করেছিলেন। এই আর্মেনিয়ানরা কেউ খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি, তাদের অপরাধ তারা ছিল খ্রিস্টান। সে সময় ভারত বা ভারতের বাইরে কোনো মুসলমান রাজনৈতিক বা বুদ্ধিজীবী এজন্য খলিফার নিন্দা করেননি। গত ২০১৮ সালে আর্মেনিয়ানদের গণহত্যার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তুরস্কের একমাত্র নোবেল পুরস্কার প্রাপক ওরহান পামুক-সহ তুরস্কের কিছু বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদের আয়োজন করেছিলেন কিন্তু তুরস্কের বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা এর বিরোধিতা করেছিলেন। এদের মধ্যে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তায়প এরডোগেনও ছিলেন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে কলকাতায় হিন্দু নিধন হয়েছিল। এই নিধনকাণ্ডে ৪০০ লোক নিহত হয়েছিল। প্রায় একমাস পরে নোয়াখালিতে কয়েকশো হিন্দুকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। মজার কথা, কোনো মুসলমান নেতা এর নিন্দা করেননি। এমনকী মুসলমান ঐতিহাসিকদের একাংশ তাদের গ্রন্থে বা নিবন্ধে কলকাতা তথা নোয়াখালি দাঙ্গার উল্লেখ করেননি, আবার যারা করেছেন তারা মৃতের সংখ্যা কমিয়ে এমন ভাবে বক্তব্য রেখেছেন যেন কলকাতা বা নোয়াখালির দাঙ্গা এমন কিছু নয়। সম্প্রতি ইসলামিক স্টেটের মৌলবাদীরা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার খ্রিস্টান হত্যা করেছেন, মেয়েদের ক্রীতদাস করেছেন। মজার কথা, ভারতের বা ভারতের বাইরে মুসলমানরা এর প্রতিবাদ করেননি।

কোরানে ক্ষমার স্থান নেই যা অন্য ধর্মে আছে। বাইবেলে যিশুখ্রিস্ট স্পষ্টই বলেছেন প্রতিশোধ-স্পৃহা বর্জন করতে হবে, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নেওয়া গর্হিত কাজ। কিন্তু কোরান সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছে, জীবনের বদলে জীবন নিতে হবে, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান। (৫।৪৫)

খ্রিস্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মতো পৌত্তলিকতার প্রতিও কোরান নির্মম। কোরানের মতে পৌত্তলিকতা ও মিথ্যাচার একই জিনিস। 'আল্লার বদলে যারা পুতুল পূজা করে তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর পূজা করলে রক্ষা পাবে না। অতএব আল্লাহর সাধনা করো।' (২০।১৭) পবিত্র কোরানের মতে--- আল্লাকে বাদ দিয়ে প্রতিমা পূজার আশ্রয় নিলে আগুনে পুড়ে মরতে হবে। প্রতিমাপূজারীদের কেউ বাঁচাতে আসবে না। (২০।২৫)

মুসলমানদের কাছে সব অমসুলিম ধর্মই শত্রু। এবং ইসলামে সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় অমুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলা হয়েছে। রমজান মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র মাস। এই মাসে ত্রিশ দিন উপবাস বা রোজা করতে হয়। কোরানের নির্দেশ : এই উপবাসের উদ্দেশ্য হলো একমাস ব্যাপী কঠিন ব্রত অন্তে শত্রুদের যেখানে পাবে হত্যা করবে (৯।৫)। স্বয়ং বিশ্বনবি হজরত মহম্মদ রমজান মাস অন্তে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নানা সময়ে মুসলমান রাজনীতিকরা খ্রিস্টান, ইহুদি-সহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে

রমজান মাসে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। আমাদের কলকাতায় লিগ নেতারা ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট রোজার পরের দিন হিন্দু নিধনের দিন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

যেহেতু ইসলাম ব্যতীত কোনো ধর্মকে ইসলাম স্বীকার করে না তাই এই ধর্ম অন্য ধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু। এমনকী ইসলামের ভিতরে যে একাধিক সম্প্রদায় আছে— সিয়া, সুন্নি, আহমেদিয়া— তাদের মধ্যে কোন ধর্ম বিশুদ্ধ তা নিয়ে নিত্য মারামারি চলছে।

কোরান পরিষ্কার বলে দিয়েছে আল্লার অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সহবাস চলবে না। এই প্রসঙ্গে হাদিস দার-উল-ইসলাম আর দার-উল-অরাব এই শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। প্রথমটির অর্থ মুসলমানদের পৃথিবী আর অন্যটির অর্থ হলো শত্রু অর্থাৎ অমুসলমানদের পৃথিবী। মুসলমানদের উদ্দেশ্য হবে অমুসলমানদের পৃথিবীকে নিয়মিত জেহাদ দ্বারা মুসলমানদের দেশে পরিণত করা। এই লক্ষ্যে মুসলমানদের কাজ হবে অবিরত যুদ্ধ করে অমুসলমানদের দেশ দখল করা। এখানে কোনো সমঝোতা চললে না। মুসলমানরা হাদিসের এই নির্দেশ ইসলামের উদ্ভবকাল থেকে মেনে আসছেন। অমুসলমান দেশে থেকে মুসলমানদের পরিকল্পনা হলো সেই দেশের কোনো অঞ্চলে ধীরে ধীরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া। এটি করার জন্য তারা সেই এলাকা থেকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মার-দাঙ্গা করে বিতাড়িত করে একেশ্বর হয়ে বসেন। তারপর সেই এলাকাকে তাঁরা প্রথমে মুসলমান স্বায়ত্তশাসিত এলাকা করার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অর্থাৎ তাঁরা 'দেশের মধ্যে দেশ' স্থাপন করবে। ভারতে জম্মু-কাশ্মীরে যেহেতু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তাই তাঁরা সেটিকে মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত করার নীতি নিয়েছেন। কাশ্মীর সমস্যার মূলকথা হলো এই। ১৭ বছরে হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেন, তাদের বিরাট অংশকে মেরে ধরে বিতাড়িত করে কাশ্মীরে মুসলমানদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেন। চীনে, রাশিয়ায়, মায়ানমার-সহ অন্য দেশে মুসলমানরা এই কাজ করে চলেছেন। কাশ্মীরে যেমন মুসলমানেরা সশস্ত্র আন্দোলন করছে, তেমনি মায়ানমার, চীন, রাশিয়ায়ও তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের ঘটনা এর বড়ো প্রমাণ।

ইসলামে সন্ত্রাসবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে বড়ো অস্ত্র হলো জেহাদ। যারা অমুসলমান তাদের ইসলামের ছত্রতলে আনতে জেহাদ বা সশস্ত্র জেহাদ বা যুদ্ধ অপরিহার্য। শুধু স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এমন মানুষের সংখ্যা নগণ্য। ভীতি প্রদর্শন ইসলামের বড়ো অঙ্গ। যারা ইসলামের সমালোচনা করবে তাদের হত্যা ও ভয় দেখানো মুসলমানদের বড়ো কাজ। এই কাজ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এখানে সহিষ্ণুতার প্রশ্ন নেই। এ যুগে সলমান রুশদি স্যাটানিক ভার্সেস লিখেছেন বলে ইরানের ধর্মনেতা তাকে হত্যা করার ফতোয়া জারি করেছেন। ভারতে মৌলবাদীদের দাবি মেনে তার গ্রন্থটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কোনো মুসলমান বুদ্ধিজীবী এর বিরোধিতা করেননি। তেমনি তসলিমা নাসরিন কোরানে নারীদের প্রতি অবজ্ঞার জন্য সমালোচনা করেছিলেন। এজন্য মুসলমান জনতা তাঁকে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান সাংবাদিক, সাহিত্যিক এর প্রতিবাদ করেননি। মোট কথা মুসলমানরা যতই ভালোকথা বলুন তাঁদের প্রায় সকলের মধ্যে একজন মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী লুকিয়ে আছেন। মুসলমানদের মধ্যে যে সামান্য সংখ্যক মুসলমান সর্ব-ধর্ম সম্বন্ধে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা মুসলমানদের কাছে ঘৃণিত হয়েছেন। আকবর সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের লক্ষ্যে 'দীন-ই-ইলাহি ধর্ম' প্রবর্তন করেন। এই মত প্রচার করার জন্য তিনি সমসাময়িক মুসলমানদের কাছে কাফের আখ্যা পেয়েছিলেন, এ যুগেও তার ব্যত্যয় হয়নি। বাবরি ধাঁচা ভাঙার জন্য হিন্দুত্ববাদীদের যাঁরা নিন্দা করছেন তাঁরা কিন্তু ভারতবর্ষে শত শত মন্দির ধ্বংস সম্বন্ধে নীরব। ইরফান হাবিবের মতো কোনো কোনো ঐতিহাসিক আবার সোমনাথ মন্দির ধ্বংসকারী সুলতান মামুদকে ঠারে ঠোরে সমর্থন করেছেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছেন। মজার কথা, সব মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁকে সাচ্চা মুসলমানের ছাড়পত্র দিয়েছেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের মতে ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম অসার, সব ধর্মের অস্তিত্ব অবাঞ্ছিত। অতএব এই ধর্মের সমর্থকদের কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী 'যুদ্ধ বা জেহাদ দ্বারা হত্যা করো'— এই মনোভাব থেকে মুসলমান দলগুলি যুগে যুগে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা নিয়েছে এবং এই বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসকে ভারত তথা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানেরা সমর্থন করছে। যারা অস্বীকার করছেন তারা জেনে বুঝে অস্বীকার করছেন। একটা মজার কথা না বললে নয়। নবি মহম্মদ আরবে নানা সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে অবিরত মারদাঙ্গা বন্ধ করার জন্য যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা কিন্তু সফল হয়নি। তাঁর অনুসারীরা যেমন অন্যদের খতম করার লক্ষ্যে অবিরত লড়াই করে চলেছে তেমনি নিজেদের মধ্যেও লড়াই করে চলেছে। সারা বিশ্বকে তারা রক্তরঞ্জিত করে চলেছে। ■

খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীর সমর্থন ছিল ভারতের প্রতি চরম আঘাত

নিত্যরঞ্জন দাস

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসেই গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ছ'মাসের মধ্যে ভারতকে স্বরাজ উপহার দিতে পারেন। চমকে উঠেছিলেন সকলে। তবে হ্যাঁ, একটি শর্ত আছে। আর তা হলো হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করে তিনি হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধন তৈরি করতে চাইলেন। গান্ধীজী ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় লিখলেন, 'খিলাফত কোনো ব্যক্তির বিষয় নয়, এটি একটি আদর্শ। যা একই সঙ্গে জাগতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এই আদর্শ বীর ধর্ম, শৌর্য ও সৌজন্য দাবি করে— তুর্কিদের এই চরম দুঃসময়ে সাহায্য করা উচিত।' প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্ক তার সাম্রাজ্য হারিয়েছে। নিপীড়িত পদানত দেশগুলি পেয়েছে স্বাধীনতা। এর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কী? কীভাবে হলো তার অমর্যাদা। এ সকল প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য গান্ধী সর্বস্ব পণ করেছেন। নিঃসন্দেহে মহৎ আদর্শ। কিন্তু তা কি বাস্তবতা বর্জিত হবে? তাই ড. আম্বেদকরের লিখিত প্রশ্ন : কোথায় ঐক্য? তা কি কখনও সম্ভব? ভারতে মুসলমান আক্রমণ ও তার ফলাফল সম্বন্ধে তিনি বলেন : মুসলমান আক্রমণের উদ্দেশ্য শুধু রাজ্যজয় ও লুণ্ঠন ছিল না, হিন্দুধর্ম ও পৌত্তলিকতাকে নির্মূল করে ভারতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ছিল এই অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য। (These Muslim invasions were not undertaken merely out of lust or conquest...But, there is no doubt that striking a blow to the idolatry and polytheism of Hindus and establishing Islam is India was also of one of the aims of these expeditions. (Dr. B.R. Ambedkar– writings and specches–Vol-8-p. 55)

এই পটভূমিকায় খিলাফতকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য গান্ধীজীর মরিয়া প্রয়াস অভিনব, সন্দেহ নাই। খিলাফত মুসলমানের আন্দোলন। 'প্যান ইসলাম বা বিশ্ব ঐস্লামিক তন্ত্রের মূল তত্ত্ব হলো দেশ-কাল নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মুসলমানের ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টি এক ও অভিন্ন। তাই জাতি হলো মুসলমান। তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক। আর তা হলো বিশ্বব্যাপী দার-উল-ইসলামের প্রতিষ্ঠা।

১৯১৯ সালের ২৭ অক্টোবর। সারা ভারতে মুসলমানরা পালন করে খিলাফত দিবস। ২৩ অক্টোবর (১৯১৯ সাল) দিল্লিতে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রথম সম্মেলনে গান্ধী সভাপতি নির্বাচিত হন। ড. আম্বেদকর বলেন, গান্ধীজীই একমাত্র হিন্দু যিনি মুসলমানের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীই ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের সফল রূপকার ও মূল চালিকাশক্তি। মুসলমানের এই ধর্মীয় আন্দোলনে কংগ্রেস ও হিন্দুদের যুক্ত করার জন্য গান্ধীজী পরের বছর (৭-৮ সেপ্টেম্বর ১৯২০) কংগ্রেসের কলকাতা সম্মেলনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। অথচ জনমানসে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজের জন্য কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তার বিপরীত। তুরস্কের পরাজিত সুলতানের সমর্থনে (তিনি আবার ভারতীয় মুসলমানদের খলিফা বা ধর্মগুরু) গান্ধীজীর নেতৃত্বে মুসলমানের খিলাফত আন্দোলন এবং খিলাফতের সমর্থনে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন।

অ্যানি বেসান্তের সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত করেননি গান্ধী-নেহরু। তাই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে গঠিত হলো ইসলামিক রাজ্য পাকিস্তান। নির্মম নৃশংস ভাবে মুসলমানরা হত্যা করে লক্ষ লক্ষ হিন্দু, শিখ। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় গৃহহারা।

১৯২০ সালের ১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর জনমত সংগঠনের জন্য মহম্মদ আলি, সৌকত আলি ও আবুল কালাম

আজাদকে নিয়ে গান্ধীজী সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সুচিন্তিত অভিমত : ‘গান্ধীজী বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, Pan-Islam অনুপ্রাণিত খিলাফত আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তার মূলে আঘাত করেছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ভারত থেকে বহু দূরে অবস্থিত কোনো রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে যদি দেশের এক বিরাট সংখ্যক জনগণের মূল স্বার্থ ও প্রকৃত সহানুভূতি যুক্ত না থাকে তবে তারা কখনোই ভারতীয় জাতির অংশ হতে পারে না। এ সত্যকে গান্ধী নিজেও প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন যে তারা এক স্বতন্ত্র জাতি। তারা ভারতে বাস করে কিন্তু ভারতের নয় (...Gandhi himself admitted in a way that they formed a seperate nation; they were in India, but not of India– R.C. Majumder–History of the freedom Movement in India–Vol.-III-P. 50)।

সেই সময় সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ভারতের মুসলমানদের আমন্ত্রণে আফগানিস্তানের নবাব ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। এ সম্বন্ধে মহম্মদ আলি বলেন : জেহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আফগানরা যদি ভারত আক্রমণ করে, তবে ভারতের মুসলমানরা তাদের পক্ষে যোগদান করতে শুধু বাধ্য নয়— যদি হিন্দুরা সহযোগিতা না করে তবে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হবে (If the Afgans invaded India to wage a holy war, the Indian Muhammdan are not only bound to grin them, but to fight the Hindus if they refuse to co-operate with them (Ibid-63)। মহম্মদ আলির ঘোষণায় সকলে স্তম্ভিত। প্রকাশ্যে দেশদ্রোহিতা! কিন্তু গান্ধীজী অবিচল। তিনি বলেন— ‘ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি অবশ্যই আফগান নবাবকে সাহয্য করব। আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলব, যে সরকার জাতির আস্থা হারিয়েছে, তাকে সাহায্য করা অপরাধ। (I would in a sense certainly assist the Amir of Afganistan, if he wages war against the British Govt...(Ibid-P. 55)। আশ্চর্যের বিষয়, কোনো কংগ্রেস নেতা মহম্মদ আলির এই সদম্ভ ঘোষণা এবং তার প্রতি গান্ধীজীর পূর্ণ সমর্থনের প্রতিবাদ করেননি।

কেরলের মালাবার অঞ্চল। বহু শতাব্দী পূর্বে আরব থেকে আগত মুসলমান এই অঞ্চলে

বসবাস শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। চুরি-ডাকাতি, খুন রাহাজানি এদের পেশা। এরা মোপলা নামে পরিচিত। খিলাফত সম্বন্ধে এদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার হয়। বিভিন্ন সূত্র হতে ইংরেজ সরকার জানতে পারে—“১৯২১ সালের প্রথম থেকেই মসজিদে মসজিদে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে উত্তেজনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্তেজক বক্তৃতা, খিলাফত আন্দোলনের জুলাই প্রস্তাব উত্তেজনার বারুদে করে অগ্নি সংযোগ। তলোয়ার, ছুরি, বর্শা গোপনে তৈরি হয়। সংগঠিত করা হয় হিংস্র দুর্বৃত্তদের। ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন নথি হতে জানা যায়— ‘আবুল কালাম আজাদ (পরে কংগ্রেস সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) ও হাকিম আজমল খাঁ সহ-খিলাফত নেতৃবন্দ চরম উত্তেজনাকর ভাষণ দেওয়ার পর Erode-এ শুরু হয় মোপলা বিদ্রোহ। ওই গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া জনৈক মোপলা নেতার বক্তৃতার অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ‘আমরা শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে স্বরাজ ছিনিয়ে নিয়েছি... ইসলাম অথবা মৃত্যু— এই দুইয়ের মধ্যে হিন্দুদের একটি বেছে নিতে হবে। পয়গম্বরের কাছ থেকে আমরা শিখেছি আল্লার পথে হত্যা পুণ্যের... খিলাফতরাজ প্রতিষ্ঠার সময় আগত (The Moplah rebellion broke out in August after khilaphat agitators including Abul Kalam Azad and Hakim Ajmal khan had been making violent speeches in that area...one Muslim Leader told we shall give Hindus the option of death or Islam. We have the example of the holy Prophet that Bit is a good act to kill for God's work. (Ibid-P. 620)।

খিলাফতরাজ ঘোষণার আয়োজন সম্পূর্ণ। ২০ আগস্ট কালিকটের জেলা শাসক কতিপয় মোপলা নেতাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে মোপলাদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। এ সংবাদ দ্রুত সর্বত্র পৌঁছে যায়। মুসলমানরা জনৈক আলি মুসালিয়ারকে খলিফা নির্বাচিত করে ঘোষণা করে খিলাফতরাজ। ১৯২১ সালের শেষ দিকে বিদ্রোহ দমিত হয়। ইংরেজের হাতে পরাস্ত হয়ে মুসলমানরা আক্রমণ করে হিন্দুদের। রক্ত হিম করা আল্লা-হো-আকবর রণধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত হয়। অতঃপর মামুদ, তৈমুর লঙ্, আহম্মদ শা, আবদালির কীর্তির পুনরাবৃত্তি। নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্বিচার হত্যা, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, হিন্দু নারীদের গণধর্ষণ, নারী অপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তর। হাজার হাজার হিন্দুকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। শংকরন নায়ারের Gandhi and Anarchy গ্রন্থে,স্বাধীনতা সংগ্রামী অ্যানি বেসান্ত সম্পাদিত New India ও Times of India এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় হিন্দুদের উপর মুসলমানের বীভৎস পৈশাচিক অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। শংকরন নায়ার দুই ধরনের লোমহর্ষক অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন : (১) জীবন্ত অবস্থায় পুরুষদের গায়ের চামড়া তুলে নেওয়া, (২) হত্যার পূর্বে হতভাগ্যদের নিজ নিজ কবর খুঁড়তে বাধ্য করা (মদিনায় পয়গম্বর মহম্মদ ৮০০ ইহুদিকে এই ভাবে হত্যা করেছিলেন।)।

বড়লাট পত্নী Lady Reading সমীপে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে মালাবারের

মহিলারা যে স্মারকলিপি পেশ করেন তা হৃদয় বিদারক : 'ভয়ংকর নিষ্ঠুর বিদ্রোহীরা যে পৈশাচিক অত্যাচার করেছে, আপনি হয়তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন। আমাদের প্রিয়জনদের ক্ষত-বিক্ষত, ছিন্ন-ভিন্ন (মৃত বা অর্ধমৃত) দেহে কূপ ও পুকুর পরিপূর্ণ। তাঁদের একমাত্র অপরাধ, পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে তারা সম্মত হয়নি। গর্ভবতী, আসন্ন-প্রসবা নারীদের পেট চিরে তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহ পথের পাশে ঝোপে-ঝাড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।...আমাদের সামনে পিতা ও স্বামীদের জীবন্ত ছাল ছাড়িয়ে পুড়িয়ে মেরেছে।...ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্ষুধার্ত, ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অথবা নগ্ন হয়ে প্রাণ ভয়ে আমরা বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়িয়েছি' (It is possible that your Ladyship is not fully appraised of all the horross and atrocities perpetrated by the fiendish rebels; of the many wells and tanks filled up with the mutilated but often only half-dead bodies of over nearest and dearest ones who refused to abandon the faith of our fathers; of pregnant women cut to pieces and left on the roadsides and in the jungles...we remember how driven out of our native hamlets we wandered, starving and naked, in the jungles and forests–(Ibid-p.-159-160)।

Servents of India Society নিযুক্ত Enqury Committee-র প্রতিবেদনে বলা হয়--- ১৫০০ হিন্দু নিহত হয়। বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয় ২০ হাজার হিন্দুকে। লুণ্ঠিত হয় তিন কোটি টাকার সম্পত্তি। মুসলমান রাজত্বে রাজস্থান ও অন্যত্র হাজার হাজার হিন্দু নারী মর্যাদা রক্ষায় প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়েছে। মালাবারেও ঠিক তেমনি শত শত হিন্দু নারী শুধু সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই করেছে আত্মহত্যা। অ্যানি বেসান্ত বলেন : 'তাঁরা যথেচ্ছ ভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন করেছে। যাঁরা ইসলাম গ্রহণে অসম্মত হন, তাদের সকলকে হত্যা অথবা বিতাড়িত করেছে। প্রায় ১ লক্ষ হিন্দু সর্বস্ব হারিয়ে এক বস্ত্রে হয়েছে গৃহহারা'। (They murdered and plundered abundantly, and killed or droveaway all Hindus who would not apostatize. Somewhere about a lakh people were driven from their homes with nothing but the clothes they had on. –Annie Besant–The future of Indian politics-p. 252)।

মালাবারের ঘটনায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রয়াস ব্যাহত হতে পারে— এই আশঙ্কায় গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অত্যাচারকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেন। গান্ধী মোপলাদের প্রশংসা করে বলেন--- মোপলারা সাহসী ধর্মভীরু। তারা ধর্মের জন্য ধর্ম নির্দেশিত পথেই সংগ্রাম করেছে। (...brave God-fearing Moplahs who were fighting for what they consider as religion and in a manner which they consider as religious (Ibid-161)।

এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৬.১.১৯২২ তারিখে এক প্রশ্নের উত্তরে Sir Willam Vincent বলেন যে, মাদ্রাজ সরকার এক রিপোর্টে জানিয়েছে যে হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়, কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা কত— তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

(...The Madras govt. reports that the number of forcible converssion probably runs to thousands but for obvious reasons it never be possible to obtain anything like and accurate estimate (Dr. Ambadkar-writing and speches–Vol. 8-P. 158)।

স্বাধীনতা সংগ্রামী অ্যানি বেসান্ত বলেন— 'খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন ও উৎসাহদান ছিল ভারতের প্রতি নতুন এক আঘাত। অতীতের ন্যায় অবিশ্বাসীদের (যাঁরা আল্লা ও মহম্মদে বিশ্বাস করে না) বিরুদ্ধে মুসলমানের অন্তরের সহজাত ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে ওঠে নগ্ন নির্লজ্জভাবে... মুসলমান নেতাদের ঘোষণা থেকে আমরা জেনেছি, আফগানিস্তান ভারত আক্রমণ করলে তারা স্বধর্মী মুসলমান হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে। শুধু তাই নয়, মাতৃভূমি রক্ষায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হিন্দুদের হত্যা করবে। আমরা দেখেছি তাদের মূল আনুগত্য মাতৃভূমির প্রতি নয়, তা হলো বাইরের মুসলমান দেশগুলির প্রতি...মালাবার আমাদের শিখিয়েছে ইসলামিক শাসনের মাহাত্ম্য। ভারতে আমরা আর একটি খিলাফতরাজ দেখতে চাই না। গান্ধী বলেছেন, তাদের ধর্ম যেভাবে শিখিয়েছে, তারা সেই ভাবেই কাজ করেছে। কিন্তু সভ্য জগতে এমন জাতির স্থান নেই, যাঁদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, যারা স্বধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাঁদের ওপর চাপাতে হবে ধ্বংসের তাণ্ডব— হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও বিতাড়ন... বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানষ হয় এই মধ্যযুগীয় বর্বরতায় বিশ্বাসীদের সভ্যতা শেখাবে অথবা দেশের বাইরে পাঠাবে নির্বাসনে... স্বাধীন ভারতের চিন্তার সময় মুসলমান শাসনের এই ভয়ঙ্কর বিপদের বিষয়টিও চিন্তা করতে হবে। (...Malabar has taught us what Islamic rule still means and we do not want to see another specimen of the "Khilafat Raj" in India... Mr. Gandhi himself stated that they had acted as they belived their religion taught there is no place in a civilised land for people who believe that their religion teaches them to murder, rob, rape, burn or drive away out of the country those who refuse to apostatise from their ancestral faiths...and people living in the twentieth century either educate people who hold these Middle Age views or else exile them...In thinking of an independent India, the menace of Muhammedan rule has to be considered." (Dr. B.R. Ambdkar-writings and speeches–Vol. 8-p. 274-275)।

অ্যানি বেসান্তের সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত করেননি গান্ধী-নেহরু। তাই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে গঠিত হলো ইসলামিক রাজ্য পাকিস্তান। নির্মম নৃশংস ভাবে মুসলমানরা হত্যা করে লক্ষ লক্ষ হিন্দু, শিখ। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় গৃহহারা। আজও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি মুসলমানের জেহাদি তাণ্ডবে রক্তাক্ত। ◻

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana® (NR)
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

কৃষক আন্দোলনে বামপন্থীদের সমর্থন বাস্তুঘুঘুদের হয়ে ওকালতি

ড. সৌমেন ঘোষ

বামফ্রন্ট যখন ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসে তৎকালীন বামফ্রন্টের সম্পাদক কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে তারা ‘বাস্তুঘুঘুদের বাসা ভাঙো’ শ্লোগান তুলেছিল। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে জোতদার-রাজের অবসান করে, ক্ষুদ্র প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদেরকে সংগঠিত করে জোতদার বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের চিরস্থায়ী ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তোলা। ভাগচাষিদের এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিকানা স্বত্ব দান, অপারেশন বর্গা, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার বা উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের পাইয়ে দেওয়া ইত্যাদি ডঙ্কানিনাদ বাজিয়ে কৃষকবন্ধু ভাবমূর্তি গড়ে তুলে গ্রামবাঙ্গলায় সিপিএম তাদের শক্তপোক্ত লাল দুর্গ গড়ে তুলতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছিল। যদিও এই বন্ধুত্বে কতটা কৃষকপ্রেম ছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ পরবর্তীকালে অনেক গবেষণাতেই প্রমাণিত হয় যে বাঙ্গলার অল্পসংখ্যক জমিই কৃষকদের মধ্যে পাট্টা হিসেবে বিলি করা হয়েছিল। আবার যেটুকু জমি বিলি করা হয়েছিল বামফ্রন্টের দীর্ঘ রাজত্বে অনেক প্রান্তিক ও ছোটো চাষি সেই জমি ধরে রাখতেও ব্যর্থ হয়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার প্রারম্ভিক পরে এই সমস্ত গালভরা কর্মসূচি দ্বারা যত না কৃষকদের উন্নয়ন ঘটিয়েছে তার চেয়ে বেশি গ্রামীণ এলাকায় সিপিএম তাদের শক্তিকে মজবুত করেছে। প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ বাম নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার মৌরসিপাট্টা ধরে রাখতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সমাজকে তাদের অনুকূলে রাখতে হবে। একথা মাথায় রেখে এই ধরনের গরিব কৃষক দরদি পদক্ষেপ করে সিপিএম এরাজ্যে তাদের ম্যারাথন সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রায় সাড়ে তিন দশক ক্ষমতা ভোগ করেছে। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে এই পঞ্চায়েতগুলি ছিল সিপিএমের দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের আঁতুড়ঘর। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ও তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র স্থাপনের নামে পঞ্চায়েতগুলি সিপিএমের ভোট ক্যাপচারিং মেশিনে পরিণত হয়েছিল। পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো ব্যক্তিগত বিষয়েও পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপ শুরু হয় আর এভাবেই সিপিএম গ্রামবাঙ্গলাকে লাল দুর্গে পরিণত করে। গ্রামবাঙ্গলায় স্থাপিত হয় এমন একটি পরিবেশ যেখানে সিপিএমের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়তে পারবে না।

শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য সর্বভারতীয় চরিত্রবিহীন কতিপয় স্বার্থান্বেষী আঞ্চলিক স্তরের কৃষকদের আন্দোলনকে বামপন্থীরা বড়ো করে তুলে ধরার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে তারা যেভাবে বৃহৎ কৃষক ও জোতদার শ্রেণীর ওকালতি করছে তা জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের আবার একবার হাস্যস্পদ করে তুলবে।

আর যে সমস্ত কৃষক পরিবার সিপিএমের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে পারলো না তাদের উপর নেমে আসে চরম প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নির্যাতন। এই সমস্ত বিরোধী ও প্রতিবাদী কৃষকদের চিরতরে অবদমিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিশেষত সিপিএম এদের উপর তাদের কিষান সভার সাংগঠনের সাহায্যে সামাজিক বয়কট বা লেবার স্ট্রাইকের মতো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হয়। এই সমস্ত কৃষকের জমির ফসল বাড়িতে আনতে না দেওয়া, জমিতে খেতমজুর লাগাতে না দেওয়া প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করে পরিবারগুলোকে ভাতে মারার ব্যবস্থা করল বামপন্থীরা। পশ্চিমবঙ্গের যে কৃষক-খেতমজুরের চিরাচরিত আত্মিক সম্পর্ক ছিল, তা ধ্বংস করে দিল মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা কৃষক ক্ষেতমজুরের পারস্পরিক সম্পর্ক অচিরেই বিনষ্ট হলো সিপিএমের রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কারণে। ঠিক যেমনভাবে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে শিল্পে অগ্রগণ্য রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে অন্তর্জলি যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছিল ঠিক সেই ভাবে। ফলস্বরূপ গ্রামীণ জীবনে নেমে এল এক চিরস্থায়ী সংকট।

অন্যদিকে নিম্নবর্গ ও দরিদ্র মানুষ এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো বড়ো বড়ো তত্ত্বকথা বলে এই সমস্ত সম্প্রদায়কে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করিয়ে পার্টির নেতারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করতে থাকল। জোতদার মহাজন খেদানোর কথা বলে নিজেরাই গ্রাম সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসল। দেখা গেল যে সহায়সম্বলহীন পার্টির ক্যাডাররা খুব অল্প সময়েই বহু সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠলো। গ্রাম উন্নয়ন, খেতমজুর কল্যাণ প্রভৃতির নামে প্রতিষ্ঠা হলো সিপিএমের ক্যাডার রাজ। অত্যন্ত সচেতন ভাবে ভূমিহীন প্রান্তিক ক্ষেতমজুরদের জমি পাট্টা হিসেবে বিলি করা হলেও তাদের হাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেওয়া হলো না কোনো বৈধ কাগজপত্র। যাতে তারা পার্টির কাছে মাথা নত করে থাকতে বাধ্য হয়। শ্রেণীশত্রু

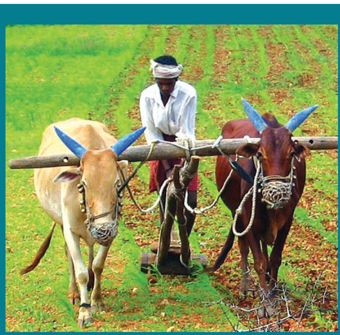

বামপন্থীরা চিরকালই জোরদার মজুতদার বড়ো চাষিদের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামের বাণী শুনিয়ে এসেছিল। আজ হঠাৎ জোতদারদের দালালিতে নেমে পড়েছে। আসলে এটাও বামপন্থীদের একটা ভণ্ডামি।

ও প্রতিক্রিয়াশীল তকমা দিয়ে কঠোরভাবে কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে কৃষিভিত্তিক গ্রামবাঙ্গলায় গরিব ও প্রান্তিক চাষিদের এক অর্থে জনমোহিনী ভাষার মায়াজালে আবদ্ধ করে এবং তাদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সিপিএম তাদের দীর্ঘকালীন কর্তৃত্ব এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই বাম বিরোধী শক্তির অক্ষমতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশেই দায়ী ছিল।

একথা সত্যি যে এই সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে এরাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু একই সঙ্গে শেষ করে দিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রথম সারির এই রাজ্যটির উন্নয়নের ধারাকে। তাই পরবর্তী বিভিন্ন গবেষণায় যে চিত্র উঠে আসে তাতে দেখা যায় ভূমি সংস্কারের ফলে প্রাপ্ত জমি কৃষকদের অনেকেই ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। গড় মাথাপিছু আয়, গড় পুষ্টির হার, শিক্ষা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রাজ্যের গ্রাফ নিম্নমুখী হতে থাকে। বিকল্প জীবিকার তাগিদে চিরাচরিত কৃষিভিত্তিক পেশা ছেড়ে এরাজ্যের যুবসমাজ পাড়ি জমাতে থাকে অন্যান্য রাজ্যে। নতুন প্রজন্মের যুব সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক চরম হতাশা। এরকম এক প্রেক্ষাপটে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে ২০১১ সালে।

পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত, লোকসভা, বিধানসভা সকল নির্বাচনে বামপন্থীদের ধারাবাহিক রক্তক্ষরণ প্রমাণ করে গ্রামীণ সমাজে গ্রামোন্নয়ন ও কৃষকপ্রেমী স্লোগান কত বড়ো শূন্যগর্ভ ছিল। জনসমাজ ও জনসমর্থন থেকে বিচ্যুত ব্রাত্য বামপন্থীরা কোনো প্রকারে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও তাদের ডাকে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সাড়া মিলছে না। এরকম অবস্থায় কেন্দ্র সরকার যখন নতুন কৃষি বিল প্রণয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও সাধারণ চাষিদের স্বার্থ রক্ষা এবং ফড়ে ও মহাজনদের হাত থেকে তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছে, তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই নতুন কৃষি আইন যে সমস্ত কায়েমি স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের আঘাত করছে তারা যথারীতি প্রতিবাদ শুরু করেছে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলি থেকে কৃষকরা কেন্দ্র সরকারের এই কৃষি নীতি 'তাদের স্বার্থ বিরোধী ও কর্পোরেট জগতের স্বার্থে রচিত' অভিযোগ তুলে দিল্লির সন্নিকটে আন্দোলন শুরু করেছে। অবরোধ করে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক। এই সুযোগে বামপন্থীরা এই কৃষকদের আন্দোলনের অন্যতম সহযোগী এবং স্বনিযুক্ত অভিভাবকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তারা এ বিষয়টির জন্য প্রচার, পথসভা এবং বিশেষত গণমাধ্যম ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতে অবিরাম প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অন্নদাতা কৃষকদের উপর ফ্যাসিবাদী কেন্দ্র সরকারের

আক্রমণ ইত্যাদি অপপ্রচার করে কেন্দ্র সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো বামপন্থীরা যে কৃষকদের সমর্থনে আওয়াজ তুলছে তারা কারা? এরা কি সম্বলহীন সাধারণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি? কখনোই না। এরা পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানের বিত্তবান কৃষক যারা শত শত একর জমির মালিক এবং যাদের হাতে কৃষিপণ্যের লাইসেন্স, মজুতদারি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকার বর্তমান। সারা দেশের কৃষি উৎপাদনের একটা সিংহভাগ এদের হাতে। কেন্দ্র সরকারের বর্তমান কৃষি নীতি যা গরিব কৃষকদের ফড়ে ও মহাজনদের থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূলে গিয়েছে। ফলত তারা কেন্দ্র সরকারের কৃষি নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে এতদিনের মৌরসিপাট্টা এবার বন্ধ হয়ে যাবে। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তাই তারা সমবেতভাবে দিল্লি সীমান্তে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য সমবেত হয়েছে। নিজেদের জন্য আগামী চার মাসের রসদ মজুত করে জাতীয় সড়ক অবরোধের মাধ্যমে জনজীবনকে রুদ্ধ করতে চাইছে। যদিও বলা হচ্ছে এই আন্দোলন অরাজনৈতিক, কিন্তু এই আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানি, মাওবাদী জঙ্গিগোষ্ঠী ও বিবেচনাহীন বিরোধী দলগুলি এবং প্রাসঙ্গিকতা হারানো বামপন্থীরা মদত জোগাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মনে রাখতে হবে, পঞ্জাব, হরিয়ানার কৃষকরা ভারতের কৃষিপণ্যের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের হাতে পড়ে ভারতের গরিব প্রান্তিক,ক্ষুদ্র ও সাধারণ কৃষকরা প্রায় সকল সুযোগসুবিধা থেকেই বঞ্চিত। ভরতুকির মতো সরকারি সুবিধার অধিকাংশই এই বৃহৎ কৃষকরা ভোগ করে থাকে এবং তার ছিঁটেফোঁটা অংশই গরিব কৃষকদের হাতে এসে পৌঁছায়। মান্ডিগুলিতে ফসল কেনার একচেটিয়া পারমিট এবং অধিকার থাকায় তারা নির্দ্বিধায় সাধারণ কৃষককে শোষণ করে দীর্ঘকাল ধরেই নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করে আসছিল। আর্থিক সংস্থান না থাকার কারণে গরিব কৃষকদের বড়ো মহাজনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এদের কাছে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে তারা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে ফসল বিক্রির সময় তাদের সুযোগসন্ধানী ফড়েদের পাল্লায় পড়তে হয়। ফলে উভয়দিক থেকেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা শোষণের শিকার হয়ে আসছিল। বর্তমান কৃষিনীতি তাদের হাতে এনে দেবে অনেকগুলি বিকল্প সুযোগ। ফসল বিক্রিতে চুক্তি সম্পাদন দর কষাকষি ও পছন্দসই বাজার অনুসন্ধানের সুযোগ তারা পাবে। এই সঙ্গে সরকারি সাহায্যের নিশ্চয়তাও মিলবে। সুতরাং কেন্দ্র সরকারের নতুন কৃষিনীতি যদি তাদের জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনে বা তাদের অধিকার সুরক্ষায় পথ দেখায় তা অবশ্যই তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে যা আগে কখনই হয়নি। বড়ো কৃষক নতুন আইন যাদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছে তারা সংগত কারণেই বিরোধিতা করবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এদের পক্ষে বামপন্থীদের সমর্থন জানানোর বিষয়টি। যখন কেন্দ্র সরকার নতুন কৃষি আইনের মাধ্যমে এই বাস্তুঘুঘুদের বাসা ভাঙতে চাইছে তখন এই আইনের বিরোধিতা করে বামপন্থীরা সেই বাস্তুঘুঘুদেরই সমর্থন করছেন? যে বামপন্থীরা চিরকালই এই জোরদার মজুতদার বড়ো চাষিদের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামের বাণী শুনিয়ে এসেছিল, আজ হঠাৎ জোতদারদের দালালিতে নেমে পড়ল। আসলে ভণ্ডামিতে বামপন্থীদের কোনো বিকল্প নেই। তারা চিরকাল মুখে গরিব ও কৃষক দরদের কথা বললেও প্রকৃত কৃষকদরদি এই কৃষি বিলের তাদের এই বিরোধিতা চরম দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য দ্বিচারিতা বামপন্থীদের কাছে নতুন কিছু নয়। বহু ক্ষেত্রেই তারা দেশবিরোধী কাজ করে এসেছে। সে দেশভাগের সময় মুসলিম লিগকে সমর্থন হোক বা বাষট্টির চীনা আক্রমণে চীনকে সমর্থনই হোক। তাদের পক্ষে এটা নতুন কিছু নয়। শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য সর্বভারতীয় চরিত্রবিহীন কতিপয় স্বার্থান্বেষী আঞ্চলিক স্তরের কৃষকদের আন্দোলনকে বামপন্থীরা বড়ো করে তুলে ধরার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে তারা যেভাবে বৃহৎ কৃষক ও জোতদার শ্রেণীর ওকালতি করছে তা জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের আবার একবার হাস্যস্পদ করে তুলবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ▯

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

মৌরসিপাট্টা বানচাল, দালালদের নাভিশ্বাস

অম্লানকুসুম ঘোষ

আকাশ বাতাস জুড়ে আচমকাই গেল গেল রব। সংবাদমাধ্যমের পাতা থেকে সংসদের গান্ধীমূর্তি সমস্তই আজ তোলপাড়। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিল নাকি ভারতীয় কৃষকদের সর্বনাশ করবে, কৃষকরা নাকি হয়ে যাবে কর্পোরেটের হাতের পুতুল। তাই হতদরিদ্র কৃষকরা এসি গাড়ি করে এসে নতুন ট্রাক্টর পুড়িয়ে বিক্ষোভে শামিল হচ্ছে। ঘুম নাকি উড়ে গেছে শরদ পাওয়ার থেকে সুপ্রিয়া সুলের মতো বহু হতদরিদ্র কৃষকের। কিন্তু কী এমন আছে এই কৃষি বিলে? কৃষি বিলে কৃষকের কি প্রকৃতই উপকার হবে? নাকি পুরো লাভের গুড়টাই খেয়ে যাবে কর্পোরেট সংস্থাগুলি?

এতদিন আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় কৃষকরা ছিল উৎপাদক। উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন কৌশল এবং কী উৎপাদন করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ কৃষকের নিজস্ব। উৎপাদন হয়ে যাবার পর উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার সময় আসতো বিপণন ব্যবস্থার ভূমিকা। শুরু হতো ফড়েদের রাজত্ব। ফড়েদের নিজস্ব সিন্ডিকেট থাকত তার বাইরে কেউ কৃষকের কাছ থেকে মাল কিনতে পারতো না। কৃষকরা সেই ফড়েদের কাছে ফড়েদের দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রি করতে বাধ্য হতো। আসল উৎপাদক কৃষক কিন্তু ফসলের মূল্যের নির্ধারক ছিল না। অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপারটা সত্যিই খুব অদ্ভুত। অর্থনীতির যে কোনো ক্ষেত্রেই কোনো বস্তুর যিনি উৎপাদক তিনিই স্থির করেন সেই বস্তুর মূল্য কত হবে। একমাত্র কৃষিক্ষেত্র ছিল ব্যতিক্রম। যেখানে উৎপাদকের হাতে ছিল না উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা।

কৃষিক্ষেত্রে ফড়েদের এই রাজত্ব চলে আসছে বহুকাল ধরেই। ফড়েদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্যই মান্ডির ব্যবস্থা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি স্থিরীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এগুলো কৃষকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। কারণ মান্ডিতেও দেখা গেছিল সেই ফড়েদেরই রাজত্ব। টাকার বিনিময়ে তারা সরকারি কর্মীদেরও নিয়ন্ত্রণ করত আর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্দিষ্ট কিছু ফসলের ক্ষেত্রে পাওয়া যেত। এছাড়াও ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সত্যিই ন্যূনতম থাকতো। ফসল বাজারজাত হবার পরে যে লাভ হতো কৃষক তার অংশ পেত না, অথচ এই কৃষিপণ্যই যখন বাজারে আসত এবং সাধারণ ক্রেতা যখন সেই কৃষিপণ্য কিনতে যেত তখন ফসলের অগ্নিমূল্য বাবদ মাঝের এই বিপুল সম্পদ চলে যেত মধ্যস্বত্বভোগী ফড়ে, আড়তদার, পাইকার এবং কিয়দংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর হাতে। এহ বাহ্য, বিভিন্ন কৃষিপণ্য ঘুরপথে ফড়েদের কাছ থেকে কিনে সেই পণ্যই প্রক্রিয়াকরণ করে বিপুল দামে বাজারজাত করে ভারতীয়

> **মৌরসিপাট্টা বানচাল হতে বসায় বিরোধিতা করছে সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে দুর্নীতিমূলক কাজকর্মে বাধা পড়েছে। বিরোধিতা করছে সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা ছলে-বলে- কৌশলে দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায়। বিরোধিতা করছে সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা তুলনামূলক ভাবে বড়ো কৃষক হওয়ায় এতদিন সম্পূর্ণ কৃষি বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।**

বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নিয়ে যেত বিদেশি কোম্পানিগুলো। কৃষক উৎপাদিত আলুর পাইকারি মূল্য কেজি প্রতি ১ টাকা থেকে ৩ টাকার বেশি কখনোই পেত না। কেনার সময় কিন্তু সেই আলুই বিক্রি হতো ৩০-৩৫ টাকা দরে আর বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সেই আলুকেই সামান্য প্রক্রিয়াকরণ খরচ যোগ করে যখন বাজারে চিপস হিসেবে বিক্রি করে ,তখন তার দাম দাঁড়ায় হাজার টাকা কিলো।

রূপকথায় একটা গল্প আছে। কোনো এক রাজপুত্রের চোখের জলে মুক্তো ঝরে। এর অর্থ হলো কৃষকের চোখের জল মুক্তোঝরা। সেই মুক্তো জড়ো হয় আড়তদার পাইকারদের গদিতে। এই অচলায়তনের কি পতন ঘটবে না? এই প্রশ্ন এতদিন জাগ্রত ছিল কৃষকের মনে। এই অচলায়তনের পতন ঘটানোর জন্যই এসেছে এই আঘাত, আর অচলায়তনে আঘাত এলে গেল গেল রব তো উঠবেই, প্রত্যাঘাত তো হবেই। সেই গেল গেল রব সেই প্রত্যাঘাতের নমুনা দেখা যাচ্ছে গোটা দেশজুড়ে। তাইতো দেখা যাচ্ছে তথাকথিত দরিদ্র কৃষকরা সদ্য কেনা ট্রাক্টর পুড়িয়ে নাকি বিক্ষোভে শামিল হচ্ছে, শত কোটির ওপর উপার্জনকারী তথাকথিত দরিদ্র কৃষকরা একের পর এক প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন। কী আছে এই কৃষি বিলে যাতে এইসব দরিদ্র কৃষকরা এত প্রতিবাদ করছে?

কৃষি বিলে কৃষককে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে কর্পোরেটের সঙ্গে চুক্তিতে যাওয়ার এবং কর্পোরেটের কাছে নিজের ইচ্ছেমতো ফসল বিক্রি করার। কর্পোরেটের সঙ্গে কৃষকের চুক্তি হবে, সেই চুক্তি কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষকের নিজের ইচ্ছাতে সম্পাদিত হবে এবং সেই চুক্তিতে কৃষি জমি হস্তান্তর বা রূপান্তর কখনোই করা যাবে না। সেই উল্লেখও চুক্তির পাঁচ নং ধারায় রয়েছে অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে কৃষিজমি কর্পোরেট গ্রাস করে নেবে সেই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা যায়। তাহলে শুধুমাত্র ফসল চাষের সময় কর্পোরেটের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া, অগ্রিম দাদন নেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ ফসল চাষ করার সহায়তা কৃষক পেতে পারে। সেই

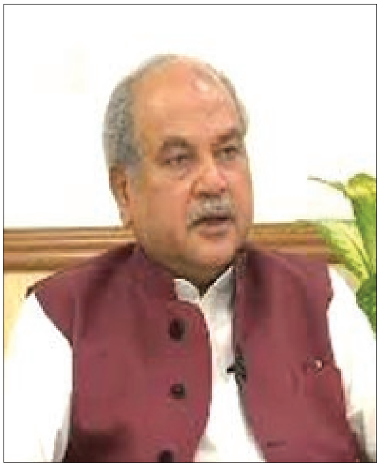

নতুন কৃষি বিল কৃষকদের পক্ষে সহায়ক হবে— বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এছাড়াও এই কৃষি বিলে কৃষককে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে নিজের রাজ্য ছাড়া অন্য রাজ্যেও নিজের ফসল বিক্রি করার। এই স্বাধীনতা যখন কৃষক পাচ্ছে তখন অন্য রাজ্যের সম্ভাবনাময় বাজারের কথা ভেবে সে নিজের ফসলের অধিক মূল্য ধার্য করতে পারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু ফসলের উৎপাদক কৃষক ফসলের মূল্য নির্ধারক হয়ে গেল। এটাকে অর্থনীতির এক যুগান্তকারী পরিবর্তন বলা যেতে পারে।

ফসল বাজারজাত করার সময় কর্পোরেটের কাছে বাজারজাত করতে পারে। এই প্রশ্ন উঠতে পারে, চুক্তিতে যদি কর্পোরেট ফসলের কম মূল্য দিয়ে কৃষককে ঠকায়? চুক্তিতে কিন্তু ফসলের মূল্য প্রথমে উল্লেখিত থাকবে অর্থাৎ ফসলের মূল্য পছন্দ না হলে কৃষক চুক্তিতে যাবে না।

কৃষি বিলকে অনেকেই নীলকরের সঙ্গে কৃষকের চুক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নীলকরের সঙ্গে কৃষক চুক্তি করতে বাধ্য ছিল। এখানে কিন্তু কৃষক চুক্তি করতে বাধ্য নয়। তার ইচ্ছে সে কর্পোরেটের সঙ্গে চুক্তি করবে কী করবে না। চুক্তি না করে শুধুমাত্র ফসল বিক্রি করার সময়ে সে কর্পোরেটের কাছে ফসল বিক্রি করতে পারে তার নিজের ইচ্ছাতে। যদি সে মনে করে কর্পোরেট তাকে ফসলের অধিক মূল্য দিচ্ছে তবেই। এতে কৃষকের লাভ হলো যে সে ফড়ের কাছে কম মূল্যে ফসল বিক্রি করার হাত থেকে বাঁচল। এখন সে কারো কাছেই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য নয় , সেটাও তার ইচ্ছাধীন। আসলে কর্পোরেট শোষণ করবে কী করবে না সেটা নির্ভর করে আইনের উপর এবং প্রশাসনের ওপর। আইন যদি কর্পোরেটকে মনোপলি বা একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে তাহলে সে শোষণ করবে যেমন নীলকররা করত। বর্তমান কৃষি বিল কর্পোরেটকে মনোপলি বা একচেটিয়া অধিকার প্রদান করছে না বরং তার চুক্তি বা বিপণন নির্ভর করছে কৃষকের সম্মতির উপর। সে ক্ষেত্রে শোষণের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। বরং ফড়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এবং কর্পোরেটদের নিজেদের মধ্যের পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ফসলের মূল্যবৃদ্ধির একটি সম্ভাবনা থেকে যায়, এতে কৃষক লাভবান হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে গত ৬ বছর ধরে কর্পোরেটের সঙ্গে চুক্তি চাষ আইনসম্মত। মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারির মতো কর্পোরেটরা কিন্তু বিভিন্ন কৃষকের সঙ্গে চুক্তিতে চাষ করিয়ে তাদের ফসল বিক্রি করছে এবং কৃষকরাও কিন্তু ভালোই লাভবান হচ্ছে। তাই নতুন কৃষি বিল কৃষকদের পক্ষে সহায়ক হবে একথা বলাই যায়। এছাড়াও এই কৃষি বিলে কৃষককে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে নিজের রাজ্য ছাড়া অন্য রাজ্যেও নিজের ফসল বিক্রি করার। এই স্বাধীনতা যখন কৃষক পাচ্ছে তখন অন্য রাজ্যের সম্ভাবনাময় বাজারের কথা ভেবে সে নিজের ফসলের অধিক উচ্চ মূল্য ধার্য করতে পারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু ফসলের উৎপাদক কৃষক ফসলের মূল্য নির্ধারক হয়ে গেল। এটাকে অর্থনীতির এক যুগান্তকারী পরিবর্তন বলা যেতে পারে।

তাহলে এই বিলের এত বিরোধিতা কারা করছে? কেনই বা করছে? বিরোধিতা তারাই করছে যাদের স্বার্থে ঘা লেগেছে বিরোধিতা করছে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত এই ফড়ের দল, যারা এতোদিন কৃষককে শোষণ করেছে নিজেদের ইচ্ছামতো। তাইতো দেখা যাচ্ছে এই বিরোধিতায় কোনো প্রকৃত কৃষক শামিল নেই। শামিল হয়েছে শুধুমাত্র ফড়েরা। বিরোধিতা করছে সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা এতোদিন কৃষক ও মধ্যবিত্ত ক্রেতার মাঝামাঝি মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে অবস্থান করে লাভের গুড় পুরোটাই খেতো। মৌরসিপাট্টা বানচাল হতে বসায় বিরোধিতা করছে সেই সমস্ত ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে যাদের দুর্নীতিমূলক কাজকর্মে বাধা পড়েছে। বিরোধিতা করছে সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা ছলে-বলে- কৌশলে দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায়, দেশের শত্রুতা করতে চায়। বিরোধিতা করছে সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা তুলনামূলক ভাবে বড়ো কৃষক হওয়ায় এতদিন সম্পূর্ণ কৃষি বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করত। একটা জিনিস লক্ষণীয়, বিরোধিতা করছে শুধু পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকরাই যাদের হাজার হাজার একর কৃষিজমি, বাড়িতে mercedesbenz। কিন্তু সেই কৃষকরা করছে না যারা মাত্র কয়েক বিঘা জমির মালিক, যারা চাষ করে লাঙ্গলে কিংবা যারা ভাড়া করা ট্রাক্টরে চাষ করে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশার সেই ছোটো কৃষকদের বা দিল্লির কাছের উত্তরপ্রদেশের সেই ছোটো কৃষকদেরও কিন্তু বিক্ষোভে দেখা যাচ্ছে না। বিক্ষোভে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র পঞ্জাব হরিয়ানার বড়ো কৃষকদের এবং তার সঙ্গে খালিস্তানপন্থী আন্দোলনকারীদের এবং তাঁর সঙ্গে শাহিনবাগ ফেরত কিছু ভাড়াটে আন্দোলনকারীদের আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে শকুন স্বভাবের বামপন্থীরা। আসলে কৃষি বিলকে ছুতো করে এই আন্দোলন দেশের সরকারকে এবং দেশের প্রশাসনকে দুর্বল করার জন্যই করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে এজন্য সতর্ক থাকতে হবে। এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য কী এবং উপস্থাপিত বিকৃত তথ্য কী সে ব্যাপারে অবহিত হতে হবে, তবেই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা গৃহীত একটি সঠিক সিদ্ধান্ত সঠিক ভাবে প্রণীত হতে পারবে।

তবে একটি বিষয়ে আরেকটু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সেটি হলো, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের উল্লেখ এই বিলে রাখা উচিত ছিল। যদিও বলা আছে যে চুক্তি কৃষক এবং কর্পোরেট-এর মধ্যে হবে উভয়ের সম্মতিতে সেখানে যে মূল্য উল্লিখিত থাকবে সেই মূল্যেই কর্পোরেটকে কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনতে হবে তবুও সেই মূল্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সমান বা বেশি হবে সে কথাটি বিলে উল্লেখ নেই। একথা সত্য যে কৃষক নিজের সম্মতিতে চুক্তি সই করবে কাজেই মূল্য কম হলে চুক্তিতে যাবে না এবং সব ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হয়ও না।

তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের দেশের কৃষকরা অধিকাংশই অশিক্ষিত ও আইনের ব্যাপারে অজ্ঞ,। তাদের যেসব ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আছে সেই ধরনের কোনো ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের থেকে কম মূল্যে বিক্রি করার জন্য চুক্তি সই করিয়ে যদি তাকে প্রতারণা করে তার থেকে রক্ষা পাবার সুরক্ষা কবচ যদি এই বিলে থাকতো অর্থাৎ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ব্যাপারটি উল্লেখ থাকত তাহলে আরও ভালো হতো। কেন্দ্রীয় সরকার কথা দিয়েছে, এই বিলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কথাটি প্রবেশ করিয়ে সামান্য সংশোধন করে বিলটিকে আরও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা হবে। □

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে হিন্দুদের অবদান যেন ভুলে না যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চন্দন রায়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে বাঙ্গালি হিন্দুর অবদান আত্মত্যাগ ও বলিদানের ইতিহাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতার মোহে বিস্মৃত হয়েছেন অথবা জামাত শিবির, হেফাজত ইসলামির মতো জিহাদিদের কাছে স্বাধীনতার চেতনার জাগ্রত বিবেককে গচ্ছিত রেখে হিন্দুদের আত্মত্যাগ ও অবদানের সত্য ইতিহাসকে গলা টিপে হত্যা করেছেন। তাই এই সত্য ইতিহাস তাঁর স্মৃতি ও বিবেককে পুনর্জাগ্রত করতে এই পর্যালোচনা East Bengal Aumni Forum-এর পক্ষ থেকে রাখছি।

> পাকপন্থীদের শত অত্যাচার, নির্যাতন, সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে বাংলাদেশের হিন্দুরা স্বাধীনতার প্রতীক নৌকা চিহ্নে ভোটদান করে আপনাকে জয়যুক্ত করেছে। আপনি যখনই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন বিরোধী শক্তি ১৯৭১ সালের মতো হিন্দুদের উপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লুটতরাজ, ধর্ষণ, হত্যা অবিরত চালিয়েছে। এমনকী আপনার দলের অনেক নেতৃস্থানীয়ও সেই অত্যাচারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে আপনার নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা আমাদের বিস্মিত করেছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে ঢাকার সোরাবউদ্দিন ময়দানে (রেসকোর্স) আত্মসমর্পণ করার পর ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এই দিনই স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় দিবস যা একটা দীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাস সৃষ্টির পিছনে যেমন রয়েছে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের গৌরবের ইতিহাস, তেমনই রয়েছে এক রাশ অপমান ও বঞ্চনার করুণ ইতিহাস। যে ইতিহাস বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় আঁচড় কাটেনি, পূর্ব-পশ্চিমের কোনো বাংলা সাহিত্যে, নাটকে, সিনেমায়, সভাসমাবেশে, আলোচনায় বা চর্চার বিষয় হয়ে ওঠেনি, এমনকী চায়ের কাপেও ঝড় তোলেনি। এটাই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি বঞ্চনা ও অবহেলার করুণ ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের তথা পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক দল বা নেতাদের পাকিস্তানি শাসকদের পূর্ববঙ্গের প্রতি বিমাতৃ ও প্রভুসুলভ আচরণের জন্য পাকিস্তান প্রীতির মোহভঙ্গ ঘটে। তৎকালীন পাকিস্তান আন্দোলনের যুবনেতা কুখ্যাত সোরাবউদ্দিনের ভাবশিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লিগ ত্যাগ করে আওয়ামি মুসলিম লিগ নামে রাজনৈতিক দল তৈরি করেন এবং পাকিস্তানের শাসককুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উর্দু নয়, বাংলা হবে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা---এই দাবিতে পাকিস্তানের সংসদে প্রথম প্রতিবাদে সোচ্চার হন পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য হিন্দু বাঙ্গালি নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ফলস্বরূপ ১৯৫২ সালের বাঙ্গালির গর্ব রক্তক্ষয়ী ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন গড়ে উঠে। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। গ্রাম-শহর, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বাঙ্গালি সংস্কৃতি চর্চার তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পয়লা বৈশাখে বর্ষবরণ, দুর্গাপূজা, নবান্ন, পৌষপার্বণ ও বসন্ত উৎসবের মতো বাঙ্গালি সংস্কৃতি চর্চা

ও উৎসব দেশাত্মবোধক সংগীত, নাটক, যাত্রাপালা গ্রামগঞ্জের স্কুল- কলেজগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। যার পুরোভাগে ছিল হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাগত আধিক্যের কারণে সমস্ত বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল পথপ্রদর্শক ও অগ্রগণ্য। কারণ তৎকালীন মুসলমান সমাজে সংগীতচর্চা, গান-বাজনা, নাটক, নৃত্যকলা চর্চা খুবই নগণ্য ছিল। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রভাবে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামি মুসলিম লিগকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামি লিগ নামক ধর্মনিরেপেক্ষ রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেন এবং অচিরেই ইসলামি পাকিস্তানের রাজনীতিতে আলোড়ন ও প্রভাব সৃষ্টি করেন। ফলে পাকিস্তানি শাসককুল ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান জনগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালিদের উপর অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন, অবজ্ঞা ও বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্বপাকিস্তানে আওয়ামি লিগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আপামর বাঙ্গালি ছাত্র যুব সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ধারা ক্রমাগত সারা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনের শহিদের স্মরণে স্মারক বেদি গড়ে ওঠে। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে। সেই উপলক্ষ্যে শহিদ বেদিগুলি ফুলে ফুলে ও বিভিন্ন রঙের আলপনায় সজ্জিত হয়। বাঙ্গালি সংস্কৃতির প্রভাবে পাকিস্তান বিরোধী নাটক, কবিতা, সংগীতে ও স্লোগানে আকাশ-বাতাস আন্দোলিত হয় যা ৫৮, ৬২, ৬৬ এবং ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আন্দোলনকে বিপথগামী ও ভণ্ডুল করতে হিন্দুদের চক্রান্তকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বসবাসরত হিন্দুদের উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্যাতন শুরু করে। জেহাদি মুসলমানদের হিংস্র বাঘের মতো লেলিয়ে দেয় হিন্দুদের উপর। হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি লুঠ, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের কারারুদ্ধ করা, হত্যা করা, ব্যবসাবাণিজ্য এমনকী সরকারি চাকুরি সমূহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা, শত্রু সম্পত্তি কালাকানুন করে হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে পূর্ববঙ্গ ছাড়তে বাধ্য করা পাকিস্তানি শাসককুলের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যত তীব্রতর হয় ততই হিন্দুদের উপর পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতন অধিক মাত্রায় নেমে আসে। হিন্দুদের উপর এই নির্যাতন নিপীড়ন সারা বিশ্বে বাঙ্গালিদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন হিসেবে বিবেচিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের গণভোটের দাবিতে গণ-অভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে পূর্বপাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। যার মধ্যে হিন্দুরা ছিল ২৭ শতাংশ, ভোট ছিল প্রায় তিন কোটি, ভোট দাতার সংখ্যা ছিল প্রায় দুই কোটি। ১০০ শতাংশ হিন্দু ভোট শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামি লিগ দল পেয়েছিল। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৬০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হতে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, পূর্বপাকিস্তানে মুসলমান ভোট বিভাজিত হয়ে পাকিস্তানপন্থী জামাত ইসলাম, মুসলিম লিগ পেয়েছিল প্রায় ৭০ লক্ষ ভোট। সুতরাং আওয়ামি লিগের পক্ষে ভোটদাতার অনুপাত ছিল হিন্দু মুসলমান ৫০ : ৫০। সুতরাং দেখা যাচ্ছে হিন্দুবাঙ্গালি ভোট পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী ক্ষমতায়নে ক্যাটালিস্ট হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে । বাধ্য হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বাংলাদেশের দাবিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন , পরবর্তীতে যা স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ নেয়। বাঙ্গালির স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পাক শাসককুল স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালিদের উপর সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেয়। শুরু করে অগ্নি সংযোগ, ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা। পাকপন্থী বাংলাভাষী জামাত, মুসলিম লিগ ইসলামি ছাত্র শিবির ও মুসলমান যুব সমাজ শহর ও গ্রামে রাজাকার, আলবদর ও আলসারের মতো সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। এই বাহিনীর কাজ ছিল স্বাধীনতার পক্ষের ছাত্র যুবাদের খুঁজে বের করে নৃশংস ভাবে হত্যা করা, হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি লুট ও দখল করা, হিন্দু নারী অপহরণ ও ধর্ষণ করা। তাই পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা জীবন ও নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে থাকে। দিনের পর দিন মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে কঠিন বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে ভারতভূমিতে আশ্রয় নেয়। পালাবার পথে অসংখ্য মানুষের প্রাণ হারিয়েছে পাকসেনা ও রাজাকারদের গুলির আঘাতে। হিন্দু যুবতী ও নারীদের কেড়ে নিয়েছে, হিন্দু যুবক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসেনি তারা। কোলের শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পথে ফেলে পালিয়ে এসেছে আপনজনেরা। এই সবের কোনো ঘটনাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে জায়গা দেয়নি কেউ। তৎকালীন সাংবাদিকদের তোলা ফোটোচিত্র পর্যালোচনা করলে সহজে অনুমেয় সর্বস্বান্ত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে যারা, তারা সবাই হিন্দু । এই সব সত্য জীবন্ত চিত্র ও ছবিগুলিকে হাতিয়ার করে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছিল। এবং এই ছবিগুলির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এক কোটি নির্যাতিত ও বিতাড়িত হিন্দু শরণার্থী ভারতের বিভিন্ন

প্রদেশের আশ্রয় শিবিরগুলিতে দীর্ঘ দশ মাস শোচনীয় অবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিল। এই বিশাল শরণার্থীর জন্য ভারতের অর্থনীতি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা ভারত সরকারের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠে। বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করতে ভারত সরকার শরণার্থী শিবিরের অসহনীয় চিত্রগুলি বিশ্ব দরবারে প্রচার করে। পরবর্তীতে ভারতের সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপে পাকিস্তানকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর ১২ হাজার ভারতীয় সেনার রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

সর্বোপরি, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয় সহযোগিতায় অর্থ সাহায্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শরণার্থীদের আশ্রয়, এমনকী যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাদের সহযোগিতা এবং অবদান কল্পনাতীত ও বিরল। বড়োই পরিতাপের বিষয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কারাবাস , আত্মবলিদান ছিল আপোশহীন, অথচ তারা ভারতচ্যুত হলো, আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের উপর পাকবাহিনীর নির্যাতন ও নিপীড়ন স্বাধীনতা আন্দোলনকে সক্রিয় ভাবে তরান্বিত করেছিল। তা সত্ত্বেও স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে হিন্দুবাঙ্গালিদের দেশচ্যুত হতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় হিন্দু শূন্য দেশে পরিণত হতে চলেছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা রাষ্ট্রহীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

স্মরণ করে দিতে চাই, বাংলাদেশে স্বাধীনোত্তরকালে আপনি বাংলাদেশে যতবার প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন আপনার বিরোধী শক্তি জামাত শিবির বিএমপি-এর মতো পাকপন্থীদের শত অত্যাচার, নির্যাতন, গালিমন্দ, এমনকী জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে বাংলাদেশের হিন্দুরা স্বাধীনতার প্রতীক নৌকা চিহ্নে ভোটদান করে আপনাকে জয়যুক্ত করেছে। আপনি যখনই পরাজিত হয়েছেন বা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ১৯৭১ সালের মতো হিন্দুদের উপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যা অবিরত ঘটে চলেছে। এমনকী আপনার দলের অনেক নেতৃস্থানীয় সেই অত্যাচারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। ফলে হিন্দুরা তাদের সাধের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। আপনার শাসনকালেও হিন্দু পুরোহিত ও সন্ন্যাসী হত্যা, ধর্মদ্রোহিতার মিথ্যা অপবাদে হিন্দু সম্পত্তি লুট, অগ্নি সংযোগ, দেব-দেবীর প্রতিমা ভাংচুর, মন্দির ধ্বংস প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে যার নেতৃত্বে রয়েছে আপনার দোসর হেফাজত ইসলাম এমনকী আপনার অনেক নেতা-মন্ত্রী, সদস্যরা। এই ক্ষেত্রে আপনার নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা আমাদের বিস্মিত করেছে।

সম্প্রতি ফ্রান্সে জিহাদি কার্যকলাপের কারণে বাংলাদেশে নিরীহ হিন্দুদের উপর অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন নেমে এসেছে। এক্ষেত্রেও আপনার ভূমিকা পাকপন্থী স্বাধীনতা বিরোধীদের উৎসাহিত করছে। আপনাকে আরও স্মরণ করে দিতে চাই— বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ ভূলণ্ঠিত হয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, আল্লাহ ও রসুলের উপর বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিকদের পরোক্ষভাবে ধর্মচ্যুত করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রকাশ্যে প্রতিনিয়ত ইসলামি ওয়াজের নামে ইসলামি ওয়াজি মৌলভিরা হিন্দুধর্মের অপমান ও কুৎসা প্রচার করে চলেছে, সেখানে আপনার প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। ফলে প্রতিনিয়ত মুসলমান জনমানসে সাম্প্রদায়িক প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের হিন্দুরা আপনার কাছে খাদ্য, বস্ত্র,বাসস্থানের সাহায্য চায় না, শুধু তারা তাদের মা-বোনের সম্মান রক্ষা ও বিষয় সম্পত্তি ও জীবনের সুরক্ষা চায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে হিন্দুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, অবদান ও আত্মবলিদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই সুরক্ষা তাদের মৌলিক অধিকার, এটা আমরা আশাকরি। আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে ভুলে যাবেন না। আপনার হাতে ৭১-এর হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার— এটাই একান্ত কামনা ।

(ইস্ট বেঙ্গল অ্যালুমিনি ফোরামের পক্ষে)

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

এখন থেকে 'প্রণব' পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যাবে—
www.bsspronabpub.com
প্রণব সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করুন—
swamivedanandamaharaj@gmail.com
maharajswaminirmalananda@gmail.com

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

মোক্ষ পুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

মোক্ষ পুরুষার্থ :

ভারতীয় সমাজে মোক্ষ হচ্ছে একটি জনপ্রিয় কল্পনা। মানুষ একে এত ভিন্ন অর্থ ও বিষয়ে ব্যবহার করে থাকেন যে, এর সঠিক অর্থ বোঝা প্রায় কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থ যাইহোক না কেন, বিষয় যা কিছুই হোক না কেন মোক্ষ শব্দের অর্থ একটাই, তা হচ্ছে মুক্তি।

এর খুবই সাধারণ অর্থ হচ্ছে জন্মজন্মান্তর থেকে মুক্তি। এই সংসার হচ্ছে দুঃখময় এবং নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য একটার পর একটা এমন অনেক জন্মে সংসারে দুঃখ ভোগ করবার জন্য আসতেই হয়। জন্ম পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তিকে মোক্ষ বলা হয় এবং সবাই মোক্ষ চেয়েও থাকেন। কিন্তু বিরোধাভাস হচ্ছে যে, সাধু, সন্ত, তত্ত্বজ্ঞানী... দুঃখী তথা পীড়িত লোক বলে থাকেন সে এই সংসার মিথ্যা এবং আমরা এ থেকে মুক্তি পেতে চাই তথাপি সংসারের আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মোক্ষের কথা বললেও তারা সংসার থেকে মুক্তি চান এমনটা হয় না। তাঁরা দুঃখ থেকে মুক্তি চান, সংসার থেকে নয়।

আমাদের সব দর্শনশাস্ত্রই ভিন্ন ভিন্ন শব্দাবলী প্রয়োগ করলেও একটি বিষয়ে সহমত যে আমরা মূলরূপে আত্মা, শরীর, প্রাণ মন বুদ্ধি ইত্যাদি নই। কিন্তু আমরা এই জগতে জন্ম নেওয়ার পর আমাদের সেই মূল স্বরূপের বিস্মরণ হয়ে যায়। শাস্ত্র যদিও বা বলে থাকেন তথাপি আমরা নিজেদের শরীর, মন, ইত্যাদি বলে থাকি। এবং এরকমটাই ব্যবহার করে থাকি। নিজের মূল সঠিক স্বরূপকে জানা হচ্ছে মোক্ষ। এখানে জানা অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা জানা নয়, সেটা হচ্ছে অনুভূতির বিষয়। আমাদের সঠিক স্বরূপকে জানা এই ক্ষেত্র থেকে আরও ঊর্ধ্বে। এজন্যই ওটা কঠিনও হয়ে পড়ে। মূল স্বরূপ জানাকে আত্মসাক্ষাৎকারও বলা হয়ে থাকে।

আত্মসাক্ষাৎকার অথবা নিজের মূল স্বরূপের অনুভূতি বিদ্যার দ্বারা হয় না, অত্যন্ত বুদ্ধিমান হলেও হয় না, ত্যাগ ও তপশ্চর্যাতেও হয় না। ধর্মকথা শোনায়, তীর্থ যাত্রায়, ব্রত উপবাস করলেও হয় না। লৌকিক জগতে যাকে ভালো কাজ বলা হয়, এমন কাজের দ্বারাও মুক্তি লাভ হয় না। সন্ন্যাসী হয়েও পাওয়া যায় না মুক্তি। লোকে বলে থাকে যে কাশী গিয়ে গঙ্গাস্নান করলে মুক্তি পাওয়া যায়। কাশী গিয়ে সন্ন্যাস নিলেও করলে মোক্ষ পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা কাশীকে পুণ্য নগরীরূপে মাহাত্ম্য দর্শানোর জন্য বলা হয়েছে। বাস্তবে এর সঙ্গে মোক্ষের কোনো সম্বন্ধ নেই।

পুনর্জন্ম হয় না— এটা মোক্ষের এক সাধারণ লক্ষণ বলা হয়েছে। পুনর্জন্ম না হলে মুক্তি পাওয়া যায়— এমনটা নয়। মুক্তি হলে পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু মৃত্যু হলেই মুক্তি হয় না। আত্মসাক্ষাৎকার জীবদ্দশাতেই হয়ে থাকে। জন্ম ও মৃত্যু কর্মের কারণে হতে থাকে। মানব জন্ম হলো কর্ম করবার জন্য। কর্মের ফল হয়। যেমন কর্ম তেমনই ফল হয়ে থাকে। ওই কর্ম ফলের ভোগ করবার জন্য যদি ওই জন্ম পর্যাপ্ত না হয় তবে দ্বিতীয়বার জন্ম নিতে হয় এবং সেখানে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। মানব জন্ম ছাড়া অন্য জন্মে কেবল ভোগই করা যায়, সেখানে কর্ম করা যায় না। মানুষের সমস্ত কাজের ফল ভোগ করা শেষ হলে তখন তার আর দ্বিতীয় জন্ম হয় না এবং সে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু একবার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে করতে আরও অনেক কাজ করে ফেলে তখন আবার তার ফল হয়। এভাবেই কর্ম, কর্মফল, আবার কর্ম এরূপ চক্র চলতে থাকে এবং জন্ম, পুনর্জন্মও হতে থাকে এবং মুক্তি পাওয়া যায় না।

এজন্য ভগবদ্গীতা বলছে যে কর্মের ফল ভোগ করবার সময় এমন কোনো যুক্তি করা শিখে নাও যাতে দ্বিতীয় কর্ম তৈরিই হয় না। এই যুক্তিকেই ভগবান যোগ বলেছেন। একে কর্মযোগও বলা হয়। এটা কেমন করে হয়? শ্রীভগবান বলছেন যে, কর্মে আসক্ত না হলে কর্ম আমাদের বাঁধে না এবং ফলও দেয় না। আসক্তি হচ্ছে মনের স্বভাব। এজন্য আসক্তি হবার জন্য মনকে বশে রেখে অনাসক্ত হতে শেখানো দরকার। মনকে বশে করা খুব কঠিন, তথাপি অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশে আনা সম্ভব। এই প্রকার মোক্ষের কথা ভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে।

মোক্ষ প্রাপ্তির পথ :

মোক্ষ লাভের কয়েকটি পথ আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এগুলো হলো জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগও রাজযোগ। তাতে মুক্তির পথ বলা হয়েছে। এদের মধ্যে যে কোনো একটি ধরে এগোলে শেষ পর্যায়ে মোক্ষে পৌঁছানো যায়। এসব পথে প্রয়াস করেও যাওয়া যায় আবার সহজ যাত্রাও করা যায়। কার যাত্রা কেমন হবে তার অঙ্ক কষা আমাদের লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা বলা সম্ভব নয়, কেননা মোক্ষ এই সংসারের বিষয় নয়, এটা সংসারের ঊর্ধ্বে। এইসব পথে কী করে চলতে হয় তা তো সব শাস্ত্রই বলে থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষ চলাই মোক্ষলাভকে সম্ভব করে। এই চলা কার কখন আর কী করে সম্ভব তা অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এটা হয় সে স্বয়ং জানে অথবা যে স্বয়ং মুক্ত হয়েছে সেই জানে। পথিক স্বয়ং জানে

না এটা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু যে মুক্ত হয়েছে সে তো অবশ্যই জানে। যেমন অজ্ঞানী নিজের অজ্ঞতা জানে না কিন্তু জ্ঞানী নিজের তথা এবং অপরের অজ্ঞানকে জানতে পারে। যেমন দৃষ্টিহীন স্বয়ং দেখতে পায় না কিন্তু যে দৃষ্টিবান সে নিজের এবং অপরের দৃষ্টিদোষকে দেখতে পারে। মোক্ষের পথ জানাও এরকমই। একজন জীবনমুক্ত অপর জীবনন্মুক্তকে এবং মোক্ষপথের পথিকের স্থিতিকে এবং যে মোক্ষপথের পথিক নয় তার স্থিতিও জানতে পারে। কিন্তু এটা কেমন করে জানতে পারে তা আমাদের লৌকিক বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না।

বুদ্ধি প্রশ্ন করে যে কেউ জীবন্মুক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ কারও মোক্ষ প্রাপ্তি হলো এর প্রমাণ কী? উত্তর হচ্ছে এই যে বুদ্ধির ক্ষেত্রে এর তো কোনো প্রমাণ নেই কারণ এটা বুদ্ধির ক্ষেত্রের ওপরে। এটা অনুভূতির ক্ষেত্র এবং অনুভূতিই এর প্রমাণ। বুদ্ধি বুঝতে না পারলেও যুগ যুগ ধরে লৌকিক জগৎ অনুভূতির অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে এবং তাকে শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ রূপে মান্যতাও দিয়েছে। এমনকী অন্যসব প্রমাণের প্রমাণও অনুভূতি ছাড়া কিছু নয়। যখন অবশিষ্ট সব প্রমাণ অপর্যাপ্ত হয়ে যায় তখন অনুভূতিই প্রমাণ রূপে থেকে যায়, এজন্য একে অস্বীকার করা যায় না।

মোক্ষের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক অর্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন এই সৃষ্টিতে সব মানুষেরই নিজ নিজ একটা প্রয়োজন রয়েছে, ওই প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্যই প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বভাব পেয়ে থাকে। ওই স্বভাব অনুসারে সবার স্বধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য নিশ্চিত হয়ে থাকে। এই কর্তব্য এবং স্বভাবকে জানা এবং তার প্রয়োজনকে পূর্ণ করাই হচ্ছে মোক্ষ। একেই ভগবদ্গীতায় নিজ কর্মের মাধ্যমে সিদ্ধি অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য তথা মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষকে প্রাপ্ত করা বলা হয়েছে।

মোক্ষ এমন একটা লক্ষ্য যা অপেক্ষা করলে পাওয়া যায় না, কিন্তু অপেক্ষা ছাড়াই যদি সৎভাবে সঠিক পথে চলতে থাকা যায় তবে সহজেই মোক্ষ লাভ করা যায়।

দুঃখ থেকে মুক্তি তো আমরা সর্বদাই

চেয়ে থাকি, কিন্তু দুঃখ আমরা কাকে মনে করব তা নিজ নিজ স্তর অনুসারে, নিজ নিজ স্থিতি অনুসারে, নিজ নিজ শক্তি অনুসারে নির্ধারিত হয়। কোনো এক ব্যক্তির যা থেকে সুখ মেলে, সেটাই অপর ব্যক্তির জন্য দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য মুক্তির ধারণাও সবার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তথাপি জ্ঞানে অজ্ঞানে সবার যাত্রা তো মুক্তির দিকেই হয়ে থাকে।

সোজাসুজি বললে মোক্ষের চিন্তা না করে অবশিষ্ট তিনটি পুরুষার্থ— ধর্ম, অর্থ ও কামকে যদি সঠিক আচরণের মধ্যে নিয়ে আসা যায়, তবে মোক্ষ নিজে থেকেই লাভ করা সহজ হয়ে যায়।

মোক্ষই জ্ঞান, মোক্ষই ব্রহ্ম, মোক্ষই হচ্ছে আত্মতত্ত্ব। সে নিজেই আমাদের বরণ করে থাকে যখন আমরা তার যোগ্য হয়ে উঠি। মোক্ষের জন্য প্রয়াস করলে তার যোগ্য হওয়া যায় না। অবশিষ্ট তিনটির সম্যক অনুশীলন করলেই তার যোগ্য হওয়া যায়।

মোক্ষের প্রকাশেই অবশিষ্ট তিন পুরুষার্থের ব্যবহার হয়ে থাকে। মোক্ষ নেই তো তিনটির মধ্যে একটিরও স্থিতি তৈরি হয় না। এমন মোক্ষ জীবনের পরমপুরুষার্থ হয়ে থাকে।

মোক্ষ পুরুষার্থের জন্য শিক্ষা :

এটা খুব কঠিন ব্যাপার। এটা একটা আজব ব্যাপারও বটে। এটা হচ্ছে পরাবিদ্যার ক্ষেত্র এজন্যই অপরা বিদ্যার একটিও মাপদণ্ড এতে প্রযোজ্য হয় না। মুণ্ডক উপনিষদ 'অথ পরা যয়া তদ্ অক্ষরম্ অধিগম্যতে' অর্থাৎ পরাবিদ্যা হচ্ছে সেই বিদ্যা যার দ্বারা ওই অক্ষরকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে পাওয়া যায় বলেই মৌন হয়ে যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলে যে এই আত্মা (যা নিজেই জ্ঞান, নিজেই মোক্ষ) অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বুদ্ধি, অত্যধিক বহুশ্রুতি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত হয় না। সে যাকে বরণ করে সেই তাকে লাভ করে থাকে।

লৌকিক শিক্ষাতেও অনুভূতির ঝলক কখনও কখনও পাওয়া যেতে থাকে, কিন্তু তার বিবিবৎ শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই জন্য এখানেও তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব হবে না।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত
প্রাক্তন অধ্যাপক

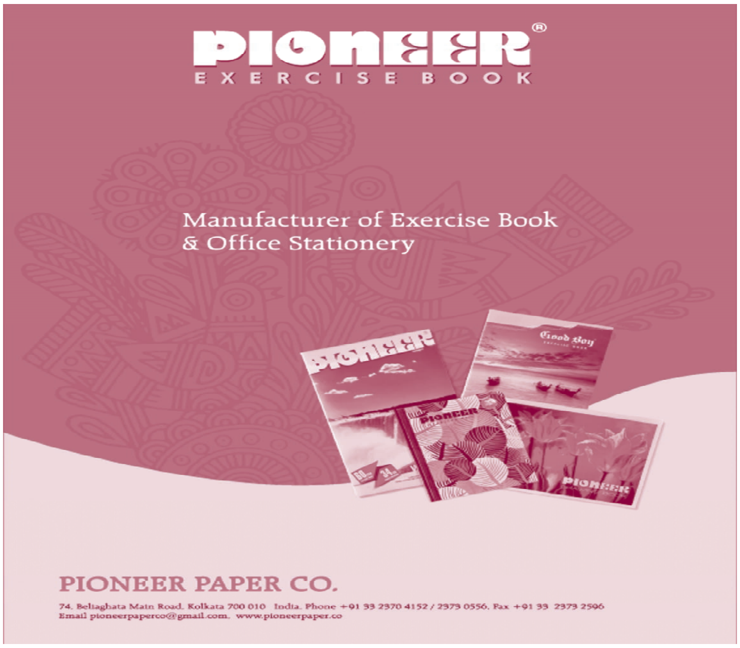

কৃষিপণ্য বিপণন কমিটি নিয়ে ইচ্ছাকৃত ধাঁধা তৈরি হচ্ছে

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

সরকারের তরফে অন্তিম সিদ্ধান্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটাই দেখতে হবে যে বিক্ষোভরত কৃষকরা আদতে তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষিদের মতের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা। আর তেমন যদি হয় তবে সেইসব রাজ্যকে অনুমতি দেওয়া যেতেই পারে যাতে তারা রাজ্যের সেন্টিমেন্ট অনুযায়ী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন ঘটিয়ে কেন্দ্রের কাছে অনুমোদন নিতে পারে।

এই নতুন তিন দফা কৃষি আইনটি যে কৃষকদের নিজস্ব স্বার্থেই তৈরি তা বুঝতে না দিয়ে কায়েমি স্বার্থের লোকেরা তাদের খেপিয়ে তুলছে। এই আইন তুলে দিলে কেবলমাত্র এই কায়েমি স্বার্থভোগীরাই সর্বক্ষেত্রে উৎসাহিত হবে।

কৃষিক্ষেত্রে বিপণনের নতুন সংস্কারটিকে বুঝতে গেলে গত কয়েক যুগ ধরে কী চলে আসছিল সেটা বোঝা দরকার। কী সিস্টেমে বিষয়টি পরিচালিত হতো তা জানা জরুরি। বর্তমান এপিএমসি (কৃষি বিপণন সংক্রান্ত) আইনে প্রত্যেকটি রাজ্য তার ভৌগোলিক সীমারেখাকে বিভিন্ন বাজার অঞ্চলে ভাগ করে দিয়ে সেখানে একটি করে এপিএমসি গড়ে দেয়। তাদের হাতেই থাকে ক্ষমতা। একই সঙ্গে এই এপিএমসি-র সঙ্গে কাজ করার জন্য সরকার কমিশন এজেন্ট বা ফড়েদেরও নিযুক্ত করে। পাইকারি ব্যবসাদাররা এই কৃষি উৎপাদন এদের মাধ্যমে কিনে নেয়। সমগ্র বাজার অঞ্চল ও এই সংক্রান্ত কাজ পরিচালনার ভার একচেটিয়াভাবে থাকে সেই এপিএমসি-রই ওপর। এর কর্তারা বাজার অঞ্চল তৈরি করে ফড়েদের কাছ থেকে মাল কিনে পাইকারদের বিক্রি করে। বোঝা যাচ্ছে এপিএমসি-র কর্তাদের হাতেই সেই অঞ্চলের পাইকারী ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ থাকে।

কমিশন এজেন্টদের মধ্যে আবার একটু মাতব্বররা চাষিদের আশেপাশে থাকা ছোটোখাটো সাব-এজেন্ট লাগিয়ে চাষির ঘর থেকে আগেভাগেই ফসল তুলে নেয়। সেই পণ্য নিয়ে হাজির হয় উল্লেখিত বাজার (মান্ডি) কেন্দ্রে। এখানেই যেহেতু 'কেনা-বেচা' দুটোই হয়। কমিশন এজেন্ট যারা এপিএমসি-রই অধীন পাইকারদের মাল বেচে দেয়, তারা আবার ছোটো পাইকারদের বেচে যারা খুচরো ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেচে লেনদেন সমাপ্ত করে। এরপর তো খুচরো ব্যবসায়ী উপভোক্তার মুখোমুখি হয়।

কমিশন এজেন্টদের পাইকারদের মাল নিলামে নির্ধারিত দামে বিক্রি করার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। ব্যাপারটা আনুষঙ্গিক অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এপিএমসি কেন্দ্রগুলিতে মাল গুদামজাত করার ব্যবস্থা অতি নিকৃষ্টমানের হওয়ায় একটু বেশিদিন রাখলেই ফসল পচে যায়। বহুবিধ কর-এর সঙ্গে উল্লেখিত ফড়েদের পাওনা যোগ হয় ফাইনাল দামের সঙ্গে। বাজারে মধ্যস্থতাকারী, এপিএমসি সদস্যদের মধ্যে ফড়েদের মধ্যে একই সঙ্গে পাইকারদের আপোশ বোঝাবুঝি সব সময় থাকে। এর সঙ্গে যোগ হয় মাল তুলে রাখার অসুবিধে ও আগে বলা নানা কর ও দালালি চাপানোর ফলে খুচরো ক্রেতাকেই অত্যন্ত চড়া দাম মেটাতে হয়। ওদিকে চাষি কিছু বোঝার আগেই পড়তি দামে তার মাল ফড়ে নিয়ে চলে যায়। এই হলো চালু ব্যবস্থা। সরকারের নতুন এপিএমসি আইনে এই গোটা মধ্যস্থতাকারী ব্যবস্থাকে এড়িয়ে চাষি যাতে এপিএমসি-র কবজা থেকে বেরোতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর প্রধান শর্ত হলো চাষি যাতে নিলামে অংশগ্রহণ করে সরাসরি সর্বোচ্চ দামে তার নিজের মাল বিক্রি করে সর্বোচ্চ লাভ পেতে পারে তার নিশ্চয়তা। এখন এটা বোঝা শক্ত নয় যে কমিশন এজেন্ট বা দালালদের বর্তমান প্রথায় একটা বাঁধা আয় ছিল। আর এই আয়ের উৎস এপিএমসি-তে পণ্যের লেনদেনের মাধ্যমেই হতো। অন্যদিকে রাজ্য মাল বিক্রি হলেই কর আদায় করত। এই টাকা দিতে হতো বিশেষ করে আপনার আমার মতো করদাতাকেই, কেননা কেন্দ্রীয় সরকারই তো

মান্ডি থেকে রেশনের শস্য কেনে। নতুন আইনে এই বিষয়টাই মধ্যস্বত্বভোগীদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। কিন্তু ভাবুন আর যাই হোক না কেন এই নতুন আইনি সংস্কারে প্রকৃত চাষির হারাবার কিছু নেই কিন্তু পাবার আছে অনেক কিছু।

এই সত্য যে কতটা অকাট্য তার প্রমাণ রয়ে গেছে কেবলমাত্র অর্থনীতিবিদ বা নীতি বিশেষজ্ঞ মহলে নয়। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমল থেকে মনমোহন সিংহ পর্যন্ত সকলেই এই কৃষি সংস্কারে উৎসাহী ছিলেন। ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকার প্রথম মডেল এপিএমসি আইন চালুর উদ্যোগ নেন। ইউপিএ সরকারের দশ বছরে মনমোহন সিংহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে এই সংস্কার চালুর কেন্দ্রীয় সরকার আদতে যেহেতু আমআদমির করের টাকায় সংগৃহীত অর্থভাণ্ডার দিয়েই শেষমেশ মান্ডি থেকে বা এপিএমসি অঞ্চল থেকে বড়ো মাপের শস্য কেনে ও কর দেয়— পঞ্জাব বা হরিয়ানার মতো রাজ্য সেই কর হারানোর ভয়ে পেছন থেকে বা সরাসরি এই বিক্ষোভকারীদের মদত দিতে পারে। কিন্তু এই আইন লাগু হলে যে লক্ষ লক্ষ কৃষক আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই যুক্তি আদৌ ধোপে টেকে না।

কিন্তু অন্য যে গূঢ় কারণ এর পেছনে থাকার বিপুল সম্ভাবনা তা হলো পঞ্জাবের ধনী বড়ো কৃষকরা (এদের চাষি বললে বুঝতে ভুল হবে) এই বিক্ষোভের মধ্যে কী বেসরকারি বিক্রি কী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তারাও অন্যান্য দাবি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অন্যসব ধরনের সংস্কার আটকাবার চেষ্টা করবে। সব ধরনের শস্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এমএসপি নির্ধারণের গ্যারান্টি দেওয়া আদৌ মানা উচিত নয়। এমন যদি ঘটে যা ঘটেই থাকে চাহিদার থেকে উৎপাদন অনেক বেশি হয়েছে সেক্ষেত্রে যদি এমএসপি ছাড়া বিক্রি বেআইনি করা হয় তাহলে কৃষকরা ঘরে ঘরে থলে ভর্তি ফসল নিয়ে বসে থাকবে কেনার কেউ থাকবে না। কেননা সরবরাহ তো চাহিদার থেকে বেশি কে কিনবে চড়া এমএসপি দিয়ে। আর সরকারের বেশি দামে বাধ্যতামূলক ক্রয় মানেই তো পক্ষান্তরে সাধারণ করদাতার টাকায় তৈরি সরকারি অর্থভাণ্ডারের অপচয়। সরকারের তরফে অন্তিম সিদ্ধান্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটাই

যদি দাবি মতো এই আইনকে কোনোভাবে প্রত্যাহার করতে হয় সেক্ষেত্রে শুধু কৃষি ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেই কায়েমি স্বার্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তারাও অন্যান্য দাবি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পথ অবরোধ, রেল অবরোধ করে অন্য সব ধরনের সংস্কার আটকাবার চেষ্টা করবে, আইন পাল্টানোর ঝোঁক বাড়বে।

সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে মোডেল এপিএমসি আইন চালু করতে অনুরোধ করেন। হ্যাঁ, বর্তমান সরকার কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগ্ম তালিকায় থাকা বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে নতুন আইনে পরিণত করেছে। ২০১৯ সালের সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেসও তার নির্বাচনী ইস্তাহারে এই আইন লাগু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। 'Congress will repeal the APMC act and make trade in agri produce– including export & inter state trade free from all restrictions।'

এই বিষয়গুলি পূর্বাপর বিশ্লেষণ করার পর আমরা আজকের কৃষক আন্দোলনের ব্যাখ্যা কীভাবে করব। নিশ্চয় কিছু কমিশন এজেন্ট যারা একই সঙ্গে কৃষকও সেজে রয়েছেন তাঁরা এর বিরোধিতা করছেন। আর (এমএসপি) উভয়ক্ষেত্রেই সরকারকে চাপ দিয়ে একটা গ্যারান্টি আদায় করে নিতে চাইছে। আর এই সহায়ক মূল্য যাতে বিশেষ লাভজনক হয় তারা সেটা নিশ্চিত করতে সরকারকে বাধ্য করতে চায়। এই উদ্দেশ্য সফল করতে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিতেও কসুর করছে না। তারা বাজারে রটিয়ে দিয়ে চাষিদের খেপিয়ে তুলছে যে সরকার ধীরে ধীরে এমএসপি-তে কেনা তুলে দেবে, যা সবৈব মিথ্যে।

তবে এখন সরকার কীভাবে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করবে? সত্যি কথা বললে বলতে হয় আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত নয়। যদি দাবি মতো এই আইনকে কোনোভাবে প্রত্যাহার করতে হয় সেক্ষেত্রে শুধু কৃষি ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেই কায়েমি স্বার্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। দেখতে হবে যে বিক্ষোভরত কৃষকরা আদতে তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষিদের মতের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা। আর তেমন যদি হয় নির্দিষ্ট সেইসব রাজ্যকে অনুমতি দেওয়া যেতেই পারে যাতে তারা রাজ্যের সেন্টিমেন্ট অনুযায়ী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন ঘটিয়ে কেন্দ্রের কাছে অনুমোদন নিয়ে নিতে পারে।

পঞ্জাব যদি যে আইনে তার কৃষদের ক্ষতি হবে তেমন আইন নিয়ে চলতে চায় তাহলে চলুক। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যগুলি যারা তাদের কৃষকদের মঙ্গল চায় যেমন বিহার ২০০৬ সালেই চলতি এপিএমসি আইন বাতিল করে কৃষিক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি করেছে, যেখানে পঞ্জাব ধুঁকছে— তাদের তো আটকানো যাবে না।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

শেখ মুজিবের ‘ভাস্কর্য’ বিতর্কে বিপন্ন ‘মূর্তি’, শঙ্কিত সংখ্যালঘু সমাজ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনকে কেন্দ্র করে ইসলামি নেতারা হুংকার দিয়েছেন, তারা বাংলাদেশকে একটি সাচ্চা ইসলামি দেশে পরিণত করে ছাড়বেন। দেশ থেকে ভাস্কর্য ও মূর্তি নিশ্চিহ্ন করে তবেই নিশ্চিন্তে নামাজ আদায় করে বেহেস্তের পথ প্রশস্ত করবেন। বৃহত্তম মুসলমান দেশ ইন্দোনেশিয়া, মিশর, মালয়েশিয়ায় যাই থাক, পবিত্র ভূমি সৌদি আরব, ইরান, কুয়েত, কাতার, পাকিস্তানে যাই হোক তাতে বাংলাদেশের মুসলমানদের কিছু এসে যায় না। তারা ইসলামের খাস বান্দা হওয়ার জন্য জীবন দিতেও পিছপা হবেন না। তারা ওয়াজ মাহফিল, ইসলামি সমাবেশ এবং সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়ে দিচ্ছেন, ভাস্কর্য ও মূর্তির মধ্যে কোনো ফারাক নেই।

মোল্লাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ সরকার জাতির জনকের ভাস্কর্য রক্ষায় এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, মূর্তি কাঠগড়ায় উঠলেও আপত্তি নেই। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক শক্তিও বলছে, ভাস্কর্য ও মূর্তি আলাদা। ইসলামি নেতাদের দাবি ঠিক নয়। যে কোনো মূল্যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপিত হবেই। সরকার ভাস্কর্য তৈরির পক্ষে তাদের শক্ত অবস্থান ব্যক্ত করে কঠোর পদক্ষেপের কথা জানায়। সরকারের এই অবস্থানের পক্ষে গত ১ ডিসেম্বর রাজধানীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ৬৫টি সংগঠন মানব বন্ধন ও সমাবেশ করে। রোজই রাজধানী ও সারাদেশে বিক্ষোভ ও সমাবেশ হচ্ছে। মূলকথা হলো, বিবৃতিতে মুজিবের ভাস্কর্যের পক্ষে জোরালো বক্তব্য এলেও মূর্তি কার্যত ‘নিগৃহীত’ অবস্থায় থেকে যাচ্ছে।

এই আন্দোলন, বিতর্কে সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাদের আশঙ্কা, সারাদেশে মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। ভাস্কর্যের সঙ্গে মূর্তি নিশ্চিহ্ন করার হুমকিতে এই হামলা আরও তীব্র করবে। এই সঙ্গে শঙ্কিত বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও। ভাস্কর্য ও মূর্তি বিতর্কে অমুসলমানরা যে ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগতভাবে নিগৃহীত হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে এবং উদ্বেগ তৈরি করছে এই কথাটা সরকার কিংবা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি কেউ অনুধাবন করতে পারছেন বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উত্থাপিত অহেতুক বিতর্কে যে অবজ্ঞা ও অবহেলায় ‘মূর্তি’ প্রসঙ্গটি আলোচিত হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়েছে। ঐক্য পরিষদ মনে করে, এর মধ্য দিয়ে দেশে অপরাপর সমাজ ও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিকে হেয় করা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা

সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম ভাস্কর্য ইস্যুতে বলেছেন, মূর্তি স্থাপন করে শেখ মুজিবকে স্মরণ করা মানে ‘মুসলমান রাষ্ট্রনায়ককে ইসলামের আলোকে দাফন কাফন না করে বিধর্মীর পন্থায় তার শেষকৃত্য করার মতোই নিন্দনীয় কাজ।’

ও বিদ্বেষ প্রচার করা হচ্ছে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাকে যুগপৎ ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে।

এক বিবৃতিতে পরিষদ বলেছে, বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ শাশ্বতকাল থেকে তাদের আরাধ্য দেব-দেবীর মূর্তি পুজো করে আসছে। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও ঠিক একইভাবে ভগবান বুদ্ধ ও প্রভু যীশুর মূর্তিকে সামনে রেখে তাদের ধর্মাচরণ ও ধর্মানুশীলন করেন। এদের ধর্মীয় অনুভূতিকে রীতিমতো আঘাত করে বা তাদের ধর্মকে অবজ্ঞা করে যেভাবে ‘মূর্তি’ শব্দটি বিদ্যমান বির্তকে তুলে ধরা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে তা দুঃখ ও উদ্বেগজনক। অনতিবিলম্বে এহেন সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্য সকল মহলের প্রতি পরিষদ আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে সবাইকে বিনয়ের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়, মূর্তিপূজকরা বাংলাদেশে ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু হতে পারে কিন্তু গোটা বিশ্বে তারা সংখ্যালঘু নয়। বিষয়টি সবারই ভাববার সময় এসেছে।

এই ‘বিদ্বেষ’ ও ‘নির্মূল’ আন্দোলনের সূচনা এভাবে। রাজধানী ঢাকার ধোলাইরপাড় চত্বরে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ভাস্কর্য তৈরির পরিকল্পনার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর গত ১৩ নভেম্বর ঢাকার গেন্ডারিয়ায় ধূপখোলা মাঠে ‘তৌহিদী জনতা ঐক্য পরিষদের’ ব্যানারে এক সমাবেশ থেকে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা করা হয়। একই দিনে রাজধানীর বিএমএ অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিস ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে শানে রিসালাত কনফারেন্সে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা মামুনুল হক প্রকাশ্যে মুজিবুরের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা করেন। এরপর গত ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে এক মাহফিলে অংশ নিয়ে হেফাজতে ইসলামের আমীর জুনাইদ বাবুনগরী হুমকি দেন, যে কোনো দল ভাস্কর্য বসালে তা ‘টেনে হিঁচড়ে ফেলে দেওয়া’ হবে। তাদের এ ধরনের বক্তব্যের প্রতিবাদে দেশজুড়ে

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যেই গত সপ্তাহে গভীর রাতে কুষ্টিয়া শহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, একটি সুবিধাভোগী মহল সাধারণ মুসলমান জনতার উত্থাপিত একটি যৌক্তিক মতামতকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে হুমকি দিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছে। তাঁর ভাষায়, ভাস্কর্যের পক্ষে থাকাটা 'মূর্তি প্রীতি ও বিজাতীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ'। কারণ মূর্তি ও ভাস্কর্যের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইসলামি আন্দোলন সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে। আমরা ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি। আমাদের নীরবতাকে দুর্বলতা ভাবা হচ্ছে। আমি সরকারকে সীমা লঙ্ঘনকারীদের নিবৃত্ত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি সতর্ক করে বলতে চাই দেশের সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান আজ ঐক্যবদ্ধ।

হেফাজতে ইসলামির নেতৃত্বে কয়েকটি ইসলামি দল মুজিবের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা করে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। কার্যত দেশব্যাপী ভাস্কর্য ও মূর্তির বিরুদ্ধেই তারা বিক্ষোভে নামে। নভেম্বর মাসের শেষের দিক থেকে মুজিব ভাস্কর্যটিকে ঘিরে সারাদেশে ভাস্কর্য বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।

বাংলাদেশে এর আগেও ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামপন্থীদের আন্দোলন ও চাপের মুখে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে গ্রিক দেবী থেমিসের ভাস্কর্যটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ন্যায়বিচারের প্রতীক গ্রিক দেবী থেমিসের একটি ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের পর চাপের মুখে সেটি স্থানান্তর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে সময় হেফাজতের দাবির সঙ্গে মতৈক্য পোষণ করেছিলেন। সরিয়ে ফেলা হয় ঢাকায় বিমানবন্দর, জিপিওর সামনের বাউল ভাস্কর্য। সরকার নীরবে হেফাজত ও অন্যান্য ইসলামি দলের দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

'দেশের শীর্ষ আলেম ও মুফতিদের' ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আলেমরা বলেছেন, পূজার জন্য না হলেও যে কোনো ভাস্কর্য নির্মাণ ও স্থাপন ইসলামসম্মত নয়। এ সময় তাঁরা ভাস্কর্য হারাম হওয়ার বিষয়ে ফতোয়া জারি করেন। শীর্ষ আলেমদের পক্ষে এ ফতোয়া প্রকাশ করেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও জমিয়তের মহাসচিব আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী, হেফাজত ইসলামের নায়েবে আমীর আব্দুর রব ইউসুফী, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরার অধ্যক্ষ মুফতি আরশাদ ও কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার মহাসচিব মুফতি মাহফুজুল হক। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন ইসলামি দলের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরার মুফতি ইনামুল হক লিখিত বক্তব্যে বলেন, যারা বলছেন মূর্তি ও ভাস্কর্য এক নয় তারা ভুল বলছেন অথবা সত্যকে গোপন করছেন। এটি কোরান ও সুন্নাহকে অমান্য করা। কোরান ও হাদিসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরে মুফতি ইনামুল হক বলেন, ইসলামে ভাস্কর্য ও মূর্তি উভয়ে নিষিদ্ধ। ভাস্কর্য ও মূর্তি নির্মাণ কঠোরভাবে হারাম ও পাপের কাজ।

ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাইয়ের পির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম আরেক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে মূর্তিপ্রীতি ও বিজাতীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনে বিরোধিতা ও কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর নির্মীয়মাণ ভাস্কর্য ভাঙচুরের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভের মধ্যে চরমোনাই পীর হিসেবে পরিচিত, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম ভাস্কর্য ইস্যুতে আরও কঠোর ভাষায় বক্তব্য দিয়ে বলেছেন, মূর্তি স্থাপন করে শেখ মুজিবকে স্মরণ করা মানে 'মুসলমান রাষ্ট্রনায়ককে ইসলামের আলোকে দাফন কাফন না করে বিধর্মীর পন্থায় তার শেষকৃত্য করার মতোই নিন্দনীয় কাজ।

অবশ্য বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ভাস্কর্য তৈরিকে ঘিরে উত্তেজনার সূচনা, তার মধ্যেই ভাস্কর্যটি স্থাপনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ভাস্কর্যটি চীন থেকে তৈরি করে আনা হয়েছে। ঢাকার যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে মাওয়ার পথে কিছু দূর গেলেই চোখে পড়বে উঁচু গোলাকার মঞ্চের মতো বেশ বড়ো একটি জায়গা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। যে কাঠামোটি কাপড়ে ঢাকা তার উচ্চতা চার তলার মতো। ঢাকার দক্ষিণে ধোলাইপাড় মোড়ে এই ভাস্কর্যটি ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের অংশ। প্রকল্পের পরিচালক সবুজ উদ্দিন থান জানিয়েছেন, এ মাসেই এটি উদ্বোধন করা সম্ভব হবে বলে তারা আশা করছেন।

অন্যদিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য 'ভাঙচুরকারী, অপরাধী ও ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা করে উস্কানিদাতাদের' বিরুদ্ধে সংবিধান এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে ভাস্কর্য, ম্যুরাল, প্রতিকৃতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে এবং এসব বিষয়ে জনমনের বিভ্রান্তি দূর করতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবকে তাদের বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতির পিতার ভাস্কর্য, ম্যুরাল, প্রতিকৃতি সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে করা রিটের প্রাথমিক শুনানির পর বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি মোহাম্মদ খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল-সহ এ আদেশ দেন। সরকারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন অবশ্য এ খবর পাঠানো পর্যন্ত কোনো বক্তব্য দেয়নি।

ভাস্কর্য ও মূর্তিবিরোধী আন্দোলনের প্রধান শক্তি হেফাজতে ইসলাম ২০১৩ সালের মে মাসে বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, নারীদের বেপর্দা হওয়া ও চাকরির ওপর কঠোর বিধিনিষেধ জারি-সহ ১৩ দফা দাবিতে ঢাকায় মতিঝিলে অবস্থান নিয়েছিল। মূল লক্ষ্য ছিল সরকার পতনের। তারা নারী নেতৃত্ব হারাম ঘোষণা করে। সরকার কঠোর হাতে সে আন্দোলন দমন করে । কিন্তু অচিরেই আকস্মিকভাবে এবং অজানা কারণে প্রধানমন্ত্রী আনুকূল্য লাভ করে হেফাজত। হেফাজত প্রধান মওলানা শফি (কয়েক মাস আগে প্রয়াত) সহ শীর্ষ নেতারা গণভবনে আমন্ত্রিত হন। যে মওলানা শফি নারী নেতৃত্ব হারাম ঘোষণা করেছিলেন তিনি ও হেফাজতের অন্যান্য নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসে ছবি তোলেন। তাদের মূল কেন্দ্র চট্টগ্রামে হাটহাজারী মাদ্রাসার জন্য সরকারি জমি দান ও বড়ো অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা হয়, কওমী মাদ্রাসার ডিগ্রিকে সাধারণ শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রির সমতুল্য ঘোষণা করা হয়। হেফাজতের তালিকা অনুযায়ী স্কুল-কলেজের পাঠ্যতালিকা ইসলামিকরণ করা হয়, হিন্দু কবি- লেখকদের লেখা কমিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও আছেন। তখন কঠোর সমালোচনা হলেও প্রধানমন্ত্রী কর্ণপাত করেননি।

সেই হেফাজত অন্যান্য ইসলামি দলকে সঙ্গে নিয়ে এখন ভাস্কর্য ও মূর্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। ▯

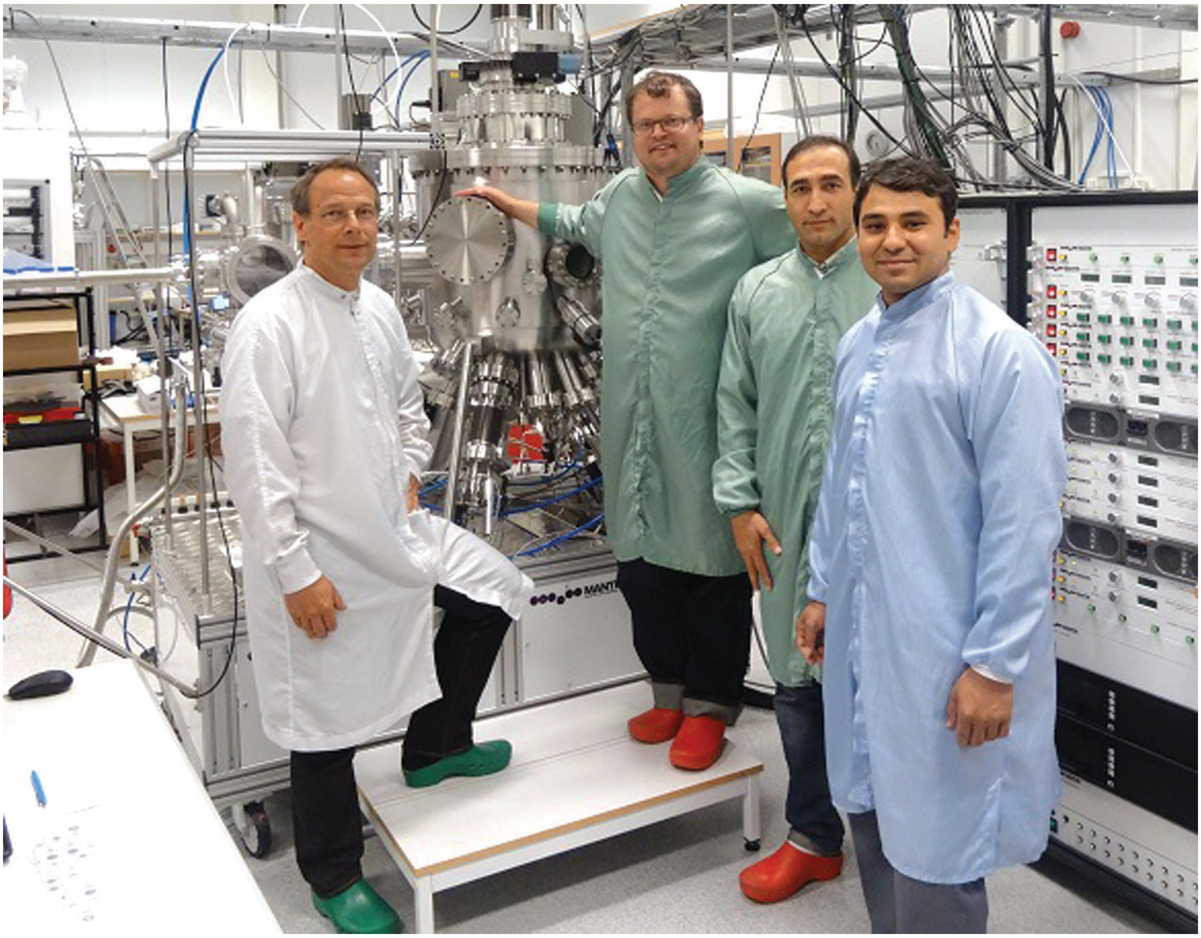

আঘাত প্রতিরোধকারী অভূতপূর্ব গ্লাসের প্রলেপ উদ্ভাবন

ড. বিপ্লব পাল

আধুনিক সভ্যতায় আমাদের প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন ধরনের পাতলা আবরণ বা প্রলেপের (Thin coating) ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তবে প্রলেপের ব্যবহার নতুন নয়। আমাদের শিল্পী ও কলাকুশলীরা প্রায় দু'হাজার বছর আগে পাতলা-ফিল্ম প্রলেপ প্রযুক্তির (Thin Film Technology) বিকাশ করেছিলেন। আমাদের স্বর্ণকাররা শত সহস্র বছর আগেও মূর্তি ও অন্যান্য সামগ্রীতে ধাতুর পাতলা ফিল্ম প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই সোনার ও রুপোর আবরণ ভারতবর্ষের মন্দির এবং স্থাপত্যগুলিতে ব্যবহার করা হতো। প্রাচীনকালে প্রলেপের ব্যবহার কেবল সজ্জাসংক্রান্ত উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি প্রতিরোধমূলক আবরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। প্রতিরোধমূলক প্রলেপের এক উল্লেখযোগ্য প্রাচীন উদাহরণ হলো জাহাজের তলদেশকে প্রলেপের দ্বারা ক্ষয় হতে রক্ষা করা। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত জাহাজ ও নৌকার তলদেশে প্রতিরোধমূলক প্রলেপ হিসেবে চর্বি এবং রজনের এক ধরনের মিশ্রণ ব্যবহার করা হতো। এছাড়াও প্রাচীন ভারতে দাঁতের ডাক্তাররা কৃত্রিম দাঁত তৈরি করতে সোনার প্রলেপ ব্যবহার করতেন।

বর্তমানকালে প্রলেপের ব্যবহার বহুমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন ননস্টিক প্রলেপ, হাইড্রোফোবিক প্রলেপ, ক্ষয়বিরোধী প্রলেপ, আঘাত প্রতিরোধকারী প্রলেপ, স্ক্রাচ প্রুফ প্রলেপ ইত্যাদি। বর্তমানকালে বিভিন্ন ধরনের রান্নার সামগ্রীতে ননস্টিকের পাতলা আবরণ দেওয়া হয়। যার ফলে রান্নার পাত্রে খাবার আটকে থাকে না আর তা সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়। সাধারণত টেফলনের পাতলা আবরণ এই ননস্টিক রান্নার পাত্রে ব্যবহার করা হয়। হাইড্রোফোবিক প্রলেপের এক উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো ছাতায়। ছাতার গায়ে এক ধরনের হাইড্রোফোবিক প্রলেপ দেওয়া হয় আর তাই ছাতায় কোনো জল দাঁড়াতে পারে না। ক্ষয় প্রতিরোধকারী প্রলেপের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ইস্পাতের টিন ও নিকেল

প্লেটিং। ইস্পাতের পৃষ্ঠতল বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্ষয় পেতে শুরু করে। টিন ও নিকেল প্লেটিং ইস্পাতকে এই ক্ষয়কারী অক্সিডেশন হতে রক্ষা করে।

এ তো গেল মানুষ দ্বারা উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম প্রলেপের সাতকাহন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রকৃতিও আমাদের অজান্তে জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রলেপ ব্যবহার করে থাকে। মানবদেহে আঘাত প্রতিরোধকারী প্রলেপের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো দাঁতের বাইরের শক্ত এনামেলের আবরণ। দাঁতের এনামেল একটি বায়োমিনিরালাইজেশন প্রক্রিয়াতে গঠিত হয় যার মাধ্যমে অ্যাম্লোল্যাস্টস নামক কোষগুলি এক ধরনের প্রোটিন নিঃসৃত করে যা শেষ পর্যন্ত আমাদের দাঁতগুলিকে এক বাহ্যিক শক্ত আবরণ দেয়। জলরোধী প্রলেপের এক জীবন্ত উদাহরণ হলো হাঁসের পালকের উপরে তেলের আবরণ। হাঁস জলে থাকলেও জলে ভেজে না, কারণ এর দেহ থেকে প্রতিনিয়ত তেলের নিঃসরণ ঘটে যা এদের পালককে ওয়াটারপ্রুফ করে তোলে। জল প্রতিরোধকারী প্রলেপের আরেকটি উদাহরণ হলো অনেক গাছের পাতায় তৈরি হওয়া মোমের আবরণ। যেমন মরু অঞ্চলের সাকুলেন্টস (Desert succulents) উদ্ভিদের পাতার ওপর মোমের এক ধরনের পুরু আবরণ তৈরি হয়, যা মরু অঞ্চলের অত্যধিক তাপমাত্রায় এদের শরীর হতে জল বেরিয়ে যেতে বাধা দেয়।

এখন জানা যাক আমরা সুইডেনের লিংশপিং ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা কী ধরনের প্রলেপের উপর গবেষণায় দিনরাত এক করে চলেছি। সম্প্রতি আমাদের গবেষণা সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের কাচের পাতলা প্রলেপের (Thin glass coating) উদ্ভাবন করেছে যা মানুষের চুলের থেকে প্রায় শতগুণ পাতলা কিন্তু সাধারণ জানালার কাঁচের থেকে তিনগুণ শক্ত। এই অভূতপূর্ব গ্লাস সুইডেনের লিংসপিং ইউনিভার্সিটির থিনফিল্ম ল্যাবরেটরিতে উদ্ভাবিত। এই গবেষণায় অন্য সহযোগী সদস্য হলেন সুইডেনের লিনিয়াস ইউনিভার্সিটির গ্লাস টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা। এই নতুন ধরনের গ্লাসের উদ্ভাবন ব্যাবহারিক ইলেক্ট্রনিক্সে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। আমরা প্রতিনিয়ত সেলফোন ল্যাপটপ ট্যাবলেটের ডিসপ্লে ও টাচ স্ক্রিনের আঘাত জনিত কারণে ড্যামেজের সম্মুখীন হই। এই নতুন ধরনের গ্লাসের কোটিং যে কোনো ডিসপ্লে ও টাচ স্ক্রিনকে ড্যামেজ ও স্ক্রাচ প্রতিরোধক করে তুলতে পারে।

এই নুতন ধরনের গ্লাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটা আশ্চর্যরকমভাবে দৃঢ়। দৃঢ়তা পরিমাপ করা হয় হার্ডনেস একক দ্বারা। বর্তমান উদ্ভাবিত গ্লাসের হার্ডনেস হলো ২১ GPa, যেখানে সাধারণ গ্লাসের হার্ডনেস ৭ GPa ও বর্তমান ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেটে বহু ব্যবহৃত ড্যামেজ প্রতিরোধক গরিলা গ্লাসের হাড্নেস ৮ GPa। এই থিন গ্লাস হলো এক ধরনের অক্সিনাইট্রাইড গ্লাস যা ম্যাগনেশিয়াম, সিলিকন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগ (Mg-Si-O-N)। ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের শক্তিশালী কেমিক্যাল বন্ডিং এই গ্লাসকে আশ্চর্যজনকভাবে হার্ড করে তুলতে সাহায্য করেছে। এই অক্সিনাইট্রাইড গ্লাসের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর স্বচ্ছতা যা ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে হিসাবে ব্যবহারের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে ড্যামেজ ও স্ক্রাচ প্রতিরোধক হিসাবে অনেক আধুনিক ইলেকট্রনিক গ্যাজেটে গোরিলা গ্লাস ব্যবহার করা হয়। কোম্পানির তথ্যানুসারে এখনও পর্যন্ত ৪০টি প্রধান ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির ৪.৫ বিলিয়ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে গোরিলা গ্লাস ব্যবহৃত হয়। গোরিলা গ্লাস ছাড়াও ড্রাগনট্রেলে (Dragontrail) গ্লাস থিন ও দৃঢ় হওয়ায় বেশ কিছু ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে বর্তমানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জাপানের সবচেয়ে বৃহৎ গ্লাস কোম্পানি, আসি গ্লাস (Ashi Glass), ড্রাগন্টরেল গ্লাসের উদ্ভাবন করে। তথ্যনুসারে ড্রাগন্টরেল গ্লাস ৬০ কেজি ভার বহন করতে পারে এর মধ্যে কোনো ফাটল দেখা দেওয়ার আগে। গোরিলা ও ড্রাগন্টরেল গ্লাসের বেশ কিছু ক্ষেত্রে অভিনব কার্যকারিতার প্রয়োজন হয়ে থাকলেও আমাদের দ্বারা উদ্ভাবিত অক্সিনাইট্রাইড গ্লাস কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী হতে পারে যা আগামীদিনে অক্সিনাইট্রাইড গ্লাসকে ব্যবহারিক ইলেকট্রনিক্সে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। উদ্ভাবিত থিন অক্সিনাইট্রাইড গ্লাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর আকার ও তৈরির পদ্ধতি। গোরিলা ও ড্রাগন্টরেল গ্লাসের প্রস্তুতিতে মলটেন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে অক্সিনাইট্রেড Mg-Si-O-N গ্লাস প্রস্তুতিতে স্পাটারিং ডিপোজিশন (Sputtering Deposition) টেকনিক ব্যবহার করায় এই গ্লাস গোরিলা ও ড্রাগনট্রেল গ্লাসের সহস্রভাগের এক ভাগ পুরু হয়। অবিশ্বাস্য রকমের পাতলা হওয়ায় Mg-Si-O-N গ্লাসের উৎপাদন খরচ আগের থেকে বহুগুণ কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই উদ্ভাবনের আরেকটি অন্যতম দিক হলো বাড়ি অথবা গাড়ির জানালাকে স্ক্রাচ প্রতিরোধক করে তুলতে এখন আর সমগ্র গ্লাসকে হার্ড করার প্রয়োজন নেই। সাধারণ জানালার কাচকে অক্সিনাইট্রাইড গ্লাস দিয়ে কোট করে দিলেই জানালাকে আঁচড়ের দাগ হতে মুক্ত করা সম্ভব। এতে আধুনিক স্মার্ট জানলার খরচ কম হবে।

উদ্ভাবিত অক্সিনাইট্রাইড গ্লাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর উচ্চ প্রতিসরাঙ্ক। কোনো স্বচ্ছ পদার্থ কতটা ঝকঝকে হবে তা নির্ভর করে এর প্রতিসরাঙ্কের ওপর। যেমন হিরের প্রতিসরাঙ্ক ২.৫ হওয়ায় হিরে অনেক বেশি ঝকঝকে। অন্যান্য গ্লাসের প্রতিসরাঙ্ক ১.৫ এর মধ্যে সীমিত। অন্যদিকে উদ্ভাবিত অক্সিনাইট্রাড গ্লাসের প্রতিসরাঙ্ক ২ হওয়ায় এই গ্লাসে নিয়মিত ডিসপ্লে অনেক বেশি ঝকঝকে দেখাবে। তাছাড়াও এই গ্লাসের আরেকটি দিক হলো এতে গোরিলা গ্লাসের মতো কোনো সঙ্কুচিত চাপ (Compressive Stress) নেই, তাই এটা বিস্ফোরণ প্রতিরোধকও। গোরিলা গ্লাসের প্রস্তুতির সময় আয়ন এক্সচেঞ্জ নামক একটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। যার মাধ্যমে গোরিলা গ্লাসের উপরিতলে এক সংকুচিত চাপ দ্বারা তৈরি হয় যা গোরিলা গ্লাসকে দৃঢ় হতে সাহায্য করে। কিন্তু এরূপ পদ্ধতির সমস্যা হলো গোরিলা গ্লাসে চাপ অসমবিস্তৃত থাকে; যেকোনো বড় আঘাত এই চাপ মুক্তিতে ইন্ধন জোগাতে পারে যা গোরিলা গ্লাসে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। দেখা গেছে যে কোনো ১৫ মাইক্রোমিটার গভীর আঁচড় গোরিলা গ্লাসে বিস্ফোরণ ঘটাতে সমর্থ। উদ্ভাবিত অক্সিনাইট্রেইড গ্লাসে পরমাণুগুলোর মধ্যে আর্কষণী শক্তি সমভাবে বিস্তৃত হাওয়ায় এই গ্লাসে কোনো আঘাতের ফলে বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই যুগান্তকারী গবেষণার বিস্তৃত বর্ণনা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা Vacum -এ সম্প্রতি ছাপা হয়েছে। গবেষণার প্রবন্ধটির শিরোনাম হলো ‘Novel transparent Mg-Si-O-N this films with high hardness and refractive index’.

(লেখক সুইডেনের লিংশপিং ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে করোনা মোকাবিলা করুন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

প্রথমেই বলি করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ আক্রমণজনিত অসুখের নিরাময়ের ওষুধ ‘আর্সেনিক অ্যালবাম ৩০’ নয়। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সরাসরি কোনো ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়া বা কোনো অসুখের জীবাণুকে মেরে অসুখ সারাতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা সকলেই রোগ প্রতিরোধের এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত। এরই নাম রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বা ইমিউনিটি। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে এই অদৃশ্য চালিকা শক্তিকেই ভাইটাল ফোর্স নামে অভিহিত করা হয়েছে। Dreangement of Viral Force causes disease অর্থাৎ এই চালিকা শক্তির বিচ্যুতি ঘটলেই অসুখে আক্রান্ত হতে পারেন। হোমিওপ্যাথি সদৃশ মতের ও লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি অর্থাৎ রোগীর রোগ লক্ষণ, শারীরিক ও মানসিক লক্ষণের সঙ্গে যে ওষুধের সাদৃশ্য পাওয়া যাবে তাই সে ক্ষেত্রের ওষুধ। মর্ডান মেডিসিনের সঙ্গে হোমিওপ্যাথির পার্থক্য বা

হোমিওপ্যাথির স্বাতন্ত্র্য এখানেই। প্রত্যেক রোগীর চারিত্রিক লক্ষণ ও মানসিক লক্ষণ আলাদা।

তাই একই অসুখের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা প্রয়োগ। তা হলে এখন কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে সবার জন্য আর্সেনিকাম অ্যালবাম ৩০ কেন? এই রকম মহামারী ও অতিমারীর ক্ষেত্রে সার্বিক রোগ লক্ষণের ডেটা তৈরি করে যে ওষুধের সঙ্গে সাদৃশ্য হবে তাই সবার ওষুধ নির্বাচিত হবে, এটাকে বলা হয় জেনাস এপিডেমিকাস। বিশ্বজুড়ে এই কোভিড-১৯-এর আক্রমণের রোগ লক্ষণের সঙ্গে আর্সেনিকাম অ্যালবামে লক্ষণ (Drug proving-এর সময় পাওয়া যায়) অধিকাংশই মিলে গেছে ও ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক এই আর্সেনিকাম অ্যালবাম ৩০-কে কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় নির্বাচিত করেছে ইমিউনিটিকে উজ্জীবিত করতে। আবার ড্রাগ প্রুভিং-এর সময় দেখা গেছে সব প্রভাবের ক্ষেত্রে আর্সেনিকাম অ্যালবাম ইমিউনিটিকে বাড়িয়েছে। তাই কোভিড-১৯-এর আক্রমণের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তথা ভাইটাল ফোর্সকে উজ্জীবিত করতে আর্সেনিকাম অ্যালবাম-৩০ সঠিক ওষুধ। পরে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী নির্বাচিত ওষুধ সেবন। ওষুধের মাত্রা আয়ুষমন্ত্রক দ্বারা নির্বাচিত। পর পর তিন দিন সকালে ১ মাত্রা, ১ মাস পরে ফের নিতে হবে। কিন্তু রোগীর নিজস্ব চিকিৎসক পরিস্থিতি বুঝে ওষুধের মাত্রা বদল করতে পারেন। যতদিন প্রতিষেধক হাতে না আসে, ততদিন করোনা প্রতিরোধে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি মুখে মাস্ক পরে বাইরে যাওয়া, অকারণে বাইরে না বেরোনো, মানুষে মানুষে দূরত্ব বজায় রাখা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। করোনা মুক্ত থাকুন, সুস্থ থাকুন।

দত্তোপন্তজী ছিলেন ভিশনারি আর্কিটেক্ট

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

গত ১১ মে, ২০২০ বিকেলে একটি টেলি কনফারেন্সের আয়োজন করেছিল 'উত্তর ২৪ পরগনা দত্তপন্থ ঠেংড়ী জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সমিতি'। তাতে মুখ্য বক্তা ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সর্বভারতীয় কার্যকর্তা সরোজ মিত্র। তিনি বলেন, অসম্ভব দূরদৃষ্টি ছিল ঠেংড়ীজীর। ১৯৬৮ সালেই ভাবতে পেরেছিলেন কমিউনিজম ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে আর কাজে আসবে না। রাজ্যসভায় এবং একবার সঞ্জীব রেড্ডির সামনে বলেছিলেন, 'Communism is in reverse gear in Russia। ভারতবর্ষে তার প্রাসঙ্গিকতা শেষ হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা'। কিন্তু দেখা গেল, তার পরেও পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। পুরনো কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন, 'ক্ষমতায় আসা আলাদা জিনিস। সিপিএম একটা বিনা- কমিউনিজমের দল'। ২০০৪ সালে ১৪ অক্টোবর ঠেংড়ীজীর দেহাবসান হয়। সিপিএমের জমানা সমাপ্তি দেখে যেতে পারেননি তিনি। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস) তৈরি করে আগামী ৫০ বছরের রসদ দিয়ে গিয়েছেন তিনি। একটি মানুষের একটি সংগঠন গড়ে তুলতেই সারা জীবন লেগে যায়, কিন্তু তিনি একের পর এক সংগঠন তৈরি করছেন। যেন এক অদ্ভুত সাংগঠনিক- ব্যক্তিত্বের পরাকাষ্ঠা। শুধু ভারতেই কেন, সারা বিশ্বে এমন নেতৃত্ব দেবার লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল অন্য জায়গায়, গঠন করতে করতেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর লক্ষ্যের অভিমুখে। কী সেই লক্ষ্য? তা হলো (Total Renaissance, সম্পূর্ণ রেনেসাঁস, জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিপ্লব Total Revolution) নয়।

১৯৭৫ সালের ২৬ জুন জরুরি অবস্থা জারি হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই প্রমুখ বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো। নানাজী দেশমুখ 'লোকসংঘর্ষ সমিতি'র নেতৃত্ব দিলেন। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হলে নেতৃত্ব দেবার অনুরোধ এলো ঠেংড়ীজীর কাছে। তিনি তখন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারি। ১৯৭৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঠেংড়ীজী কটক থেকে সরোজ মিত্রকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের একটি বিল্ডিংয়ে বৈঠক হচ্ছে। চেনাই যাচ্ছে না ঠেংড়ীজীকে, এমন ছদ্মবেশ নিয়েছেন তিনি। সরোজবাবুর পাশেই বসে আছেন, সরোজবাবু চিনতে পারেননি প্রথমে। ওই সভায় সার্বিক হতাশা ঝরে পড়লো— আর কিছু করার নেই জরুরি অবস্থায়, সিপিএম পালিয়ে গেছে, ইন্দিরা এক-এক করে সকল নেতাকে জেলে ঢোকাচ্ছেন, বিরোধী দলগুলির কাজ থমকে আছে, অথচ ইন্দিরার সভায় হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হচ্ছে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ হয়েছে, এভাবে কাজ হবে কী করে? শান্তকণ্ঠে ঠেংড়ীজী বললেন, এই অবস্থা থাকবে না। ১৭ মাস পরেই ইন্দিরার শাসন খতম হয়ে যাবে। সরোজবাবু বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, আপনি কি কোনো জ্যোতিষীর মতামত দিচ্ছেন? এরকম মাস গুনে বলা যায়? ঠেংড়ীজী বললেন, ইন্দিরা গান্ধী এভাবে প্রসাসন চালাতে পারবেন না। কারণ তাঁর ডিক্টেটর হবার যোগ্যতাও নেই। এত বড়ো দেশে জরুরি অবস্থা দীর্ঘদিন জারি রেখে নিজের ভাবমূর্তি ধরে রাখা তাঁর কম্ম নয়, তার জন্য যোগ্যতা লাগে। এরপর ঘটনাচক্রে সরোজ মিত্রও জেলে গেলেন। ছাড়া পেলেন যখন, মিলিয়ে দেখলেন, ১৭ মাস।

সঙ্ঘবিচার ধারার রাজনৈতিক দল জনসঙ্ঘকে জনতা পার্টিতে মিশিয়ে দেওয়া হলো। এই দল পরবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করলো। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমস্ত পার্টিকে একত্রিত করার কাছে

সক্রিয় হয়ে ইন্দিরাকে হারানো পর্যন্ত থাকলেন তিনি, তারপর বেরিয়ে এলেন। কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা হবার, সরকারের গুপুত্বপূর্ণ পদ পাবার মোহ তাঁর ছিল না। পদ্মভূষণ, অন্য অসামরিক পুরস্কারও ফিরিয়ে দিতে পারেন অনায়াসে। এমনই উচ্চকোটির মানুষ ছিলেন তিনি। বিনয়ের সঙ্গে বলতেন, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার আমি মুক্ত। বিএমএস প্রেসিডেন্ট নরেশ গাঙ্গুলির অনুরোধে তার দায়িত্বও নিলেন না। সেই পত্রবাহকের কাজ করেছিলেন সরোজ মিত্র। সরোজবাবুকেই তিনি বললেন চিঠিটি খুলে, পড়ে শোনাতে। ইতস্তত করছেন সরোজবাবু, ঠেংড়ীজী বললেন, আরে খোলো, নরেশবাবুর চিঠিতে এটাই লেখা আছে।

ঠেংড়ীজী দৈনিক ব্যবহার লিপিবদ্ধ না হলেও তা ছিল চমকপ্রদ। ৫৭, সাউথ অ্যাভিনিউ, নিউ দিল্লিতে রয়েছেন। মে মাসের রোদ্দুর, দুপুর দু'টো। গেঞ্জি-লুঙ্গি পরে সরোজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওই দপুরে চক্কর কাটছেন ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে। কেন? প্রিয় এক মুচির সঙ্গে দেখা করে যাবেন, প্রিয় ধোপা যে ওখানেই থাকেন, তার সঙ্গে দেখা করা চাই। দিল্লিতে এলে তাদের সঙ্গে দেখা না হলে কষ্ট পেতেন। এক ঘণ্টা রোদে রোদে চরকি কেটে দুজনে এক গেলাস করে লস্যি খেয়ে ফিরে এলেন। তারপর সরোজবাবুকে বললেন, স্টেশনে নিয়ে চলো, নাগপুর যাবো। এমন ব্যক্তিগত জীবন ভাবা যায় না!

একবার দিল্লিতে রয়েছেন ঠেংড়ীজী। ১০-১২ জন দর্শনার্থী, সবাই প্রবুদ্ধ মানুষ। এদের মধ্যে রয়েছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকও। একজন সরোজবাবুকে বলছেন, ঠেংড়ীজীকে একটি থিসিস দেখতে দিয়েছি মতামতের জন্য। ঘটনার কথা স্মরণ করে সরোজবাবু স্তম্ভিত হয়ে যান। থিসিসের টাইটেল 'Dialectical materialism versus Anasakta Yoga'. কতটা দূরদৃষ্টি থাকলে তাঁর কাছে এরকম থিসিসের জন্য মত নিতে আসেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক! আর কত কী বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল তার— ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতাদর্শ থেকে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন সব বিষয়েই তাঁর পড়াশোনা ছিল।

ঠেংড়ীজীর ব্যক্তিত্বের পুরোটা কেউ জেনে উঠতে পারেননি। বলা হয়, একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের Time Horizon ৫ বছর, একজন দেশনেতা বা স্টেটসম্যানের Time Horizon ১০ বছর, কিন্তু একজন সাধুসন্তের Time Horizon ১০০ বছর। রাষ্ট্রঋষি দত্তপন্থ ঠেংড়ীজীর প্রাসঙ্গিতা ১০০ বছরেও অম্লান। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমরা স্মরণ করতে পারি, ১৯৮২ সালে নাগপুরের সঙ্ঘ অধিবেশনে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী— আগামী শতাব্দী (২০০০ সাল থেকে পরবর্তী ১০০ বছর ও তার পরেও) হবে হিন্দু-শতাব্দী। পৃথিবীর জ্ঞানীগুণী মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে, আর নতুন লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছে না, এগোচ্ছে না, একটি স্থবিরতা যেন পেয়ে বসেছে, তাই এখন সমগ্র বিশ্ব ভারতীয় বেদ-দর্শনের মধ্যে নতুন আশার সন্ধানে মনোনিবেশ করেছে। বিশ্বজুড়ে ভারততত্ত্ব এক অভূতপূর্ব অধ্যয়ন।

সমস্ত সংগঠন রচনার মধ্যে যে একটা বৃহৎ লক্ষ্য স্থির করে এগোতে হয়, তা কর্মজীবন ও দর্শনের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠেংড়ীজী। শ্রমিক সংগঠন ও তার রাজনীতির পরত কেমন হবে, তার একটি উদাহরণ দিয়ে দত্তোপন্তজীর আন্দোলনের রূপরেখা দেখিয়েছেন সরোজবাবু। ১৯৬৯ সালে উপরাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি-র কাছে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে মেমোরেন্ডাম দিচ্ছেন, তাতে রাজ্যসভা ভেঙে দিয়ে Functional Represntation করতে দাবি জানাচ্ছেন। রাজ্যসভায় সমস্ত বিষয়ের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিত্বকে পাঠাতে হবে, ছিল দাবি। রাজ্যসভা হবে ভারতের একটি এক্সপার্ট গ্রুপ। আজকের শ্রমিক সংগঠনগুলি এসব ভাবনা ভাবতেও পারে না!

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ যখন গঠন করলেন বিদেশি পুঁজিপতিদের প্রতি একটি পরিষ্কার বার্তা দিয়ে রাখলেন। তিনি বুঝেছিলেন বিশ্বের যা কিছু রিসোর্স, আমেরিকাকে বাদ দিয়ে, তা প্রায় সবই রয়েছে সাউথ-এ। আর ক্যাপিট্যাল যা আছে তা নর্থ-এ। যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, তা কেন পরমুখাপেক্ষী হবে? বিকল্প অর্থনীতির কথা এবং পথনির্দেশ করিয়ে তিনি লিখলেন 'Third Way' গ্রন্থ। Preface of Hindu Economics-এ তিনি পরিষ্কার উল্লেখ করলেন, দেশের অর্থনীতি কোন দিকে যাওয়া দরকার, Sustainable Development বা চিরায়ত উন্নয়ন কোন পথে তা বুঝিয়ে দিলেন। Self-employment System-এর পক্ষে তিনি সওয়াল করেছেন, যা নেহরু জমানায় রাশিয়াকে নকল করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আগে ভারতবর্ষের গ্রামগুলি সমস্ত পেশার মানুষের বসবাসে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল; নাপিত, ছুতোর, মুচি, তন্তুবায়, কামার, কুমোর, স্যাকরা সবাই থাকতেন একই গ্রামে। দত্তোপন্তজী মনে করতেন, দরকার ছিল স্বাধীন ভারতে এদের সকলের Skill Development করিয়ে দেওয়া এবং মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা করা, তা না করে নেহরু রুশ মডেলে আইটিআই গড়ে তুলে কিছু আধা কারিগর বানিয়ে শিল্পের জন্য নতুন ভারত গড়তে চাইলেন। আর তার সঙ্গেই স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামো ভেঙে পড়লো, কারিগর সমাজ নষ্ট হয়ে গেল। শিল্পকারখানায় কাজের লোভে সামান্য ট্রেনিং নিয়ে ছাত্রেরা ছুটলো মাসকাবারি চাকরি করতে। কলের সস্তা জিনিস বাজারে এলো, গ্রামের কামারের জিনিস, কুমোরের জিনিস আর বিকোলো না। ঠেংড়ীজী বলতেন, দেশীয় জিনিস যদি সামান্য নিম্নমানেরও হয়, তাই পরম আদরে ব্যবহার করা দরকার, স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'-ই তো মাথায় তুলে নিয়েছিল দেশবাসী! এসব স্বদেশী চিন্তাচেতনার প্রয়োজন আজ এসে পড়েছে। বাড়িতে বাড়িতে কেন ফলের গাছ লাগানো হবে না? উদ্ভিজ্জ নানান সামগ্রী নির্মাণের জন্য গাছ লাগাতেই হবে। সরোজবাবু রাষ্ট্রঋষি ঠেংড়ীজীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, আর্থিকক্ষেত্রে দেখতে হবে অঞ্চলে অঞ্চলে সমীক্ষা করে কী করা যায়! কতটুকু আছে সেই অঞ্চলে, কতটুকু নেই, কতটুকু ছাড়াই দৈনন্দিন জীবন চলে যায়, কতটুকু সেই অঞ্চলেই উৎপাদন করে নেওয়া যায় ইত্যাদি। যেমন সাবানের পাউডার উৎপাদনের জন্য তো আহামরি হাই-টেকনোলজির দরকার নেই, এর জন্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাবান কেন কিনবো? বাইরে থেকে যা আসছে, তার মধ্যে করোনা নেই, অন্য রোগজীবাণু মুক্ত কে তার গ্যারান্টি দেবে? সরোজবাবু রাখঢাক না রেখেই বলেছেন, ইকোনোমিকসের ওই প্রফেসরদের দিয়ে কিছু হবে না; ওইসব নোবেলবিজয়ীদের দিয়েও হবে না। দেশীয় আর্থিক চিন্তন নষ্ট করে দিয়ে কৃত্রিম উন্নয়ন কোনো কাজের কথা নয়!

ঠেংড়ীজী 'কার্যকর্তা' পুস্তকে যে কোনো সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমস্ত গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিত্ব নির্মাণের জন্য, কীভাবে কাজ করতে হবে, তার দিশা দেখিয়েছেন তিনি। এমন দুর্লভ সংগঠক পৃথিবীতে বিরল। ■

নিরামিশ আহার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

ডাঃ আর এন দাস

জীবনের শুরু থেকেই খাদ্যের ব্যবস্থা ভগবান করে দিয়েছেন। গর্ভাবস্থায় মা, তারপর বড়ো হলে স্বয়ং প্রকৃতি থেকে আহৃত পদার্থ দ্বারা দেহের পোষণ ও পুষ্টি সাধন করতে হয় শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয় রোধের জন্য। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মায়ের অপুষ্টির কারণে রোগগ্রস্ত সন্তানের জন্ম হয়। সুষম খাদ্যের অভাবেও নানা প্রকারের নির্দিষ্ট রোগের সূত্রপাত হয়। তাই আমরা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন সব খাদ্য যেমন শাকসবজি, শস্যদানা, বাদাম, বীজ, ফলমূল, দুধ, দই ও ঘি দিয়েই শরীরের ভরণপোষণ করে থাকি।

ভগবানের দেওয়া এই দেহে প্রকৃতিতে অবস্থিত সমস্ত প্রাণীতেই দুই প্রকারের রোগ প্রতিরোধের এবং সংক্রমণ থেকে বিমুক্তির উপায় নির্মিত হয়েছে। প্রথমত, সহজাত বা অন্তর্নিহিত এবং দ্বিতীয়ত, অধিগত বা অর্জিত। প্রথমটি জন্ম থেকেই প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে। আমরা এখানে মানুষের শরীরের উদাহরণ দেব। চোখের জলে, মুখের লালায়, মায়ের দুধে, চামড়ার উপর এমন সব রাসায়নিক পদার্থ আছে যা বহিরাগত কীটাণু, জীবাণু বা বিষাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে আজীবন অতি নিপুণ ভাবে রক্ষা করে যায়। সেসবের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নাম আছে। যেমন লাইসোজাইম, ল্যাক্টোফেরিন, ইম্মুনোগ্লবুলিন, ইন্টারফেরন ইত্যাদি।

তাছাড়াও আছে পাকস্থলীর অ্যাসিড যা খাদ্য বা জলের মধ্যে দিয়ে আসা প্রায় সমস্ত কীটাণুকে মারতে সক্ষম। এছাড়াও আছে বিভিন্ন প্রকারের রক্তবাহিত কোষ যারা সশস্ত্র সৈনিকের মতো বহিরাগত শত্রুকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করে। সেইসব কোষগুলো কখনও অ্যান্টিবডি তৈরি করে কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে কীটাণু বা বিষাণুকে আত্মসাৎ করে ফেলে।

রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতির উপরও অনেকখানি নির্ভর করে কেননা মন ও শরীরের সম্বন্ধ যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। মানসিক ব্যাধিগ্রস্থরা শারীরিক রোগের সহজ শিকার হয়। এটা পরীক্ষাগারেও প্রমাণিত হয়েছে।

রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা নির্ভর করে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপর যা প্রচুর পরিমাণে শাকসবজিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ

বলা যায়, লাল, হলুদ, সবুজ ছাড়াও আর অন্যান্য রঙের ফলমূল, শাকসবজিতে যেমন গাজর, বিট, কমলালেবু বা অন্য অনেক টক জাতীয় ফলে এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। এর মধ্যে বিটাক্যারটিন, ফ্লেভোনয়েড, ভিটামিন ই ও সি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যারা শুধু সংক্রমণ নয়, ক্যানসারের নিরাময় পর্যন্ত করতে পারে। এবার আসি দ্বিতীয় প্রকার ইমিউনিটির কথায় যা হচ্ছে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট কোনো এক বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়, পোলিও বা জলাতঙ্ক রোগের টিকাকরণ। শরীরের মধ্যে ওই রোগের নিষ্ক্রিয় করা জীবাণুকে বারংবার প্রবেশ করিয়ে শরীরকে ওই নির্দিষ্ট রোগের থেকে রক্ষা করার পদ্ধতি হচ্ছে অর্জিত রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা।

খাদ্যাখাদ্যের অভ্যাস এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার মাধ্যমে এই দুই প্রকারের ইমিউনিটিই প্রভাবিত হয়। নিরমিষভোজীরা বেশি পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল খান। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইটোকেমিক্যাল শরীরের মধ্যে যায় আর তাতে করে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ভিটামিন বি-১২, জিংক আর ওমেগা-৩-ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পদার্থ শস্য ও উদ্ভিদভোজীরা পেয়ে যান প্রতিদিনকার খাদ্য তালিকার মধ্যে থেকেই। এগুলি আধুনিক পরীক্ষাগারের তথ্য থেকেই বলা হচ্ছে। পরিমিত আহার, নিদ্রা ও দৈনিক ব্যায়াম শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতাতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, তিন প্রকার আহারের কথা বলা হয়েছে। রাজসিক ও তামসিক খাবারে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় অন্যদিকে সাত্ত্বিক খাদ্যে আয়ু ও শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং রোগের নিরাময় হয়। কি সেই সাত্ত্বিক খাদ্য? 'সুখপ্রীতি বিবর্ধনা, রস্যা, স্নিগ্ধা স্থিরা ও হৃদ্যা'।

হাজার বছর ধরে আমাদের বৈদিক ঋষি-বিজ্ঞানীরা দৈনন্দিন জীবনে প্রমাণ করে দেখিয়ে গেছেন যা আজ আমরা পরীক্ষাগারে নির্ভুল বলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি।

আমাদের শরীরের মধ্যে আছে রোগপ্রতিরোধে অংশগ্রহণকারী প্লীহা, মজ্জা ও অসংখ্য লসিকাগ্রন্থি ছাড়াও আরও অনেক অঙ্গ যারা নিরন্তর দেহকে সুস্থ রাখতে সদা তৎপর থাকে। সঠিক রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে অক্সিজেনের মাত্রা শরীরের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছান সুস্থ থাকার মূল চাবিকাঠি। প্রাত্যহিক ব্যায়ামের মাধ্যমে বিশেষ করে যোগাসনে রক্তের লোহিত ও শ্বেতকণিকার উদ্ভব ও বৃদ্ধি হয়। অনুলোম, বিলোম প্রাণায়াম, অগ্নিসার, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, ধনুরাসন এবং সূর্যনমস্কারে রক্তসংবহন ও লসিকাতন্ত্রের কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে আছে ৬০,০০০ কিমি ব্যাপী রক্তবহা নালীগুলি। তাছাড়া, শরীরের মধ্যে আছে স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃস্রাবী হরমোনের এক নিখুঁত সামঞ্জস্য। পরিমিত ও শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার, নিদ্রা অর্থাৎ বিশ্রাম আর দৈনিক যোগাসন— এ সমস্তই বিভিন্ন প্রকারের তন্ত্রগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যে অপরিহার্য।

ক্ষয়িষ্ণু শরীরে মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের এবং অস্থিসন্ধির রোগগুলি বার্ধক্যজনিত হলেও তাদের প্রকোপ ও প্রভাবকে হ্রাস করা সম্ভব এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের দ্বারা। আর সংক্রমণ সম্বন্ধীয় রোগগুলি যেমন, ক্ষয়রোগ বা টিবি, টাইফয়েড, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি ব্যাধির প্রতিরোধ করা যায় উপযুক্ত আহারবিহার ও জীবনশৈলীর পরিবর্তন ঘটিয়ে। পানীয়জলকে ফুটিয়ে নিলেই সমস্ত জীবাণু মরে যায় এবং জলকে বিশুদ্ধ করা যায়। আমাদের শাস্ত্রে শৌচের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। জৈনধর্মে সূর্যাস্তের পূর্বেই খাবারের নিদান আছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে নিদ্রাত্যাগের প্রভূত উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

ভগবানকে আমরা মাছ-মাংসের ভোগ দিতে পারি কি? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, পত্রম (তুলসী), পুষ্পম (যে কোনো সাদা ফুল), ফলম (যে কোনো সুমিষ্ট রসাল ফল) এবং তোয়ম (জল) ভক্তির সঙ্গে অর্পণ করলে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। আর সেটাকেই প্রসাদ করে বৈষ্ণব ভক্তরা ভোজন করেন। সেইজন্য তাঁরা সর্বদাই নিরোগ থাকেন।

নিরামিষ ভোজনের অসংখ্য উপকারিতার কথা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন। নিরামিষভোজী আইনস্টাইন এবং জর্জ বার্নার্ড শ'য়ের কথা কারও অবিদিত নয়। বর্তমান লেখক চিকিৎসক বলে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নিরামিষ ভোজন অর্থাৎ ফলফুল ও শস্যাদির উপকারিতার অসংখ্য উদাহরণ দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত দেখতে পান। মহিলাদের মূত্রথলির সংক্রমণ নিরাময়ের জন্য শুদ্ধজলে শৌচক্রিয়া ও প্রচুর পরিমাণে পানীয় ও তাজা ফলের রসে রোগনিরাময়ের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। আমাদের শরীরে রক্তের পি.এইচ ৭.৪ যাকে বলা হয় ক্ষরপ্রধান রস। প্রায় সমস্ত ফল ও শাকসবজি খেলে, আমাদের শরীরে এই ক্ষররসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পক্ষান্তরে, আমিষ খাদ্য খেলে সেই দেহরস অম্লপ্রধান হয় যা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর কেননা তাতে কোষের অকালমৃত্যু ঘটে। বর্তমান করোনা 'ভাইরাস' মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে, নিরামিষ খাবার খেলে ইমিউনিটি বাড়ে এবং আমেরিকায় চিকিৎসা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে নিরামিষভোজীদের সংক্রমণ ও মৃত্যু আমিষভোজীদের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। নিরামিষভোজীরা সোয়াপ্রোটিনের বেশি ব্যবহার করেন যাতে থাকে 'আইসোফ্লাবিন' যার বিশেষ নাম হচ্ছে 'ডাইডজেইন'। এটা 'টি' নামক শ্বেতকণিকার কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় যাতে ইমিউনিটিও বাড়ে। আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আমিষ খাদ্যের মধ্যে থাকে 'আইরন' বা লোহার মতো অনেক প্রো-অক্সিড্যান্ট যা দেহের ইমিউনিটি বা রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, নিরামিষভোজীদের খাদ্যে 'আইরন' কম থাকায় ইমিউনিটি বাড়ে। গবেষকরা বলেন নিরামিষ ভোজনে বেশি পরিমাণ 'ফাইটোস্টেরল' ও 'ফাইবার' থাকে ও কম থাকে ফ্যাট। এতে করে আমিষভোজীদের তুলনায় দেহের ইমিউনিটি অনেক বেশি বাড়ে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, 'ভিটামিন ডি' টিবি, হৃদরোগ ও হেপাটাইটিসকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। এই ভিটামিনটি বেশি করে দুধ, দই এবং ছানার মধ্যে পাওয়া যায় যা আবার নিরামিষভোজীদের খাদ্য তালিকায় অপরিহার্য।

তাই উপসংহারে বলা যায় নিরামিষভোজীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক কারণ ছাড়াও শারীরিক দিক থেকে বেশি লাভবান হন আমিষভোজীদের তুলনায়। বিশেষত, শস্য ও উদ্ভিদভোজীরা সাম্প্রতিক করোনা কীটাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং রোগ বিমুক্তিতেও অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে পারবেন। ▌

ওয়েট লিফটার হবার স্বপ্ন সফল হয়নি রবি ঘোষের

বাঙ্গলার চলচ্চিত্র জগৎকে তিনি বস্তুতই পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে। ভারতের চলচ্চিত্র জগতে বাঙ্গলার জন্য বয়ে এনেছেন এক অনন্য স্থান। বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে তাঁর নাম।

শুক্লা সিকদার

রবীন্দ্রাথ ঘোষদস্তিদার, একজন আমবাঙ্গালি যিনি অভিনয়ের প্রতি নিজের আত্মোৎসর্গের জোরেই হয়ে উঠেছিলেন বাংলা সিনেমার কালজয়ী অভিনেতা ও কমেডিয়ান।

১৯৯৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হলেও চলচ্চিত্র প্রেমীদের মনে তাঁর অভিনয়ের স্মৃতি অমলিন। তাঁর মৃত্যুর দু-দশক পেরিয়ে আজও ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে তিনি এতখানি প্রাসঙ্গিক যে অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে আপামর চলচ্চিত্রপ্রেমী জনতা আজও তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। ১৯৩১ সালের ২৪ নভেম্বর কোচবিহারে মামাবাড়িতে জন্ম হয় তাঁর। বাবা জিতেন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদার ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বরিশালের বাসিন্দা। সম্প্রতি ২৪ নভেম্বর তাঁর আরও একটি জন্মদিবস অতিক্রান্ত হলো ।গণমাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করার অভিনব উদ্দীপনা দেখা গেল। সব দেখে ধারণা করা মুশকিল যে দীর্ঘ দু-দশক পূর্বে চিরিবিদায় নিয়েছেন তিনি। সময় পরিবর্তন হয়েছে, ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে বিপুল রদবদল হয়েছে কিন্তু আজও তাঁর অভিনয়ের অমোঘ আকর্ষণ ও প্রাঞ্জলতা এতটাই যা কোনো শয্যাশায়ী রোগীকেও মানসিকভাবে সুস্থ করে তুলতে পারে।

তাই আজ আবার একবার ফিরে দেখার পালা, একবার অনুধাবন করার পালা, তাঁর সেই সফরটিকে যা পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত পরিবারের বেটেখাটো ছেলেটিকে সকলের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে দিয়েছিল।

ছোটোবেলা থেকে আর পাঁচটা নিতান্ত সাধারণ ঘরের ছেলের মতোই বেড়ে উঠেছিল সকলের প্রিয় রবীন্দ্রনাথ। জীবনে চলার পথে ব্যর্থতাও এসেছিল।

১৯৪৯ সালে কলকাতার 'সাউথ সাবার্বান মেইনস্কুল' থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর জিমন্যাস্টিক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আশুতোষ জিমনাশিয়ামে 'ব্যান্টাম ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১১৮ পাউন্ড ভারোত্তোলন করতে গিয়ে অসফল। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ হাতছাড়া। তারপর সায়েন্সে ইন্টারমিডিয়েট স্তর সম্পূর্ণ করে আশুতোষ কলেজে স্নাতকস্তরও সম্পূর্ণ করেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্কশাল কোর্টে কর্মরত ছিলেন। ইতিমধ্যে খানিকটা ঝোঁকের বশেই পিএলটি-র সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা দত্ত, অশোক ঘোষাল, প্রেমাশিস সেনের সঙ্গে গড়ে তুললেন নাটকের দল 'বন্ধুমহল'। সেই সময়ের নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ি, নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য— এদের কারও কাছ থেকেই কিছু শেখার নেই বলে তার মনে হয়েছে। তবুও কখনো আশুতোষ কলেজের ছাদে কখনো আবার বাড়িতে বাড়িতে ফাঁকা ছাদ খুঁজে নিয়ে চলে রিহার্সাল। কিন্তু, ওই রিহারসালই সার। পয়সার অভাবে মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়ে ওঠে না আর। অভিনয়ের জন্য মা ও মামার সমর্থন পেলেও বাবা জিতেন্দ্রনাথ গোষদস্তিদারের ধারণা ছিল যে অভিনয় করে জনপ্রিয় হওয়ার মতো চেহারা রবীন্দ্রনাথের নেই, যদিও বাবার সেই আশঙ্কাকে ছেলে রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছিলেন অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা, নিরলস পরিশ্রম, ধৈর্য ও প্রজ্ঞার জোরে।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৫২ সালে এক বন্ধুর সহযোগিতায় যোগ দিলেন এলটিজিতে। অভিনয় জগতে উৎপল দত্তকে তিনি গুরু বলে মানতেন। ঠিক এই কারণে তাঁর অভিনয় করা অজস্র অসামান্য ছবির মধ্যে ১৯৭৪ সালে ঠগিনী ছবিতে উৎপল দত্তের সঙ্গে তাঁর অভিনয় অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। দ্রোণার্জুনের সমরের কথা মনে করিয়ে তিনি তাঁর গুরু উৎপল দত্তের সঙ্গে অভিনয় করতেন। অভিনয় দেখলেই বোঝা যেত যে তিনি গুরুকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ঠিক কতটা শিখেছেন! গুরুর স্থান দিয়েছিলেন চার্লি চ্যাপলিনকেও। নিজেকে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে পরিচয় দিলেও কমেডিতে তিনি বরাবরই দেখিয়ে দিয়েছিলেন দক্ষতা। মানুষকে হাসানোর মতো কঠিন কাজটিই তিনি তাঁর সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে অতি সহজে করতেন।

ঠগিনী ছবির শুটিং চলাকালীনই একদিন ফ্লোরে দেরিতে পৌঁছোলেন তিনি। তারপর দুপুরে ব্রেকের আগে পর্যন্ত নির্বিঘ্নে শুটিং চলার পর জানা গেল সেই সকালেই নিজের মাকে দাহ করে এসেছেন, তাই দেরি। পেশাদরিত্বকে তিনি এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, তিনি ফ্লোরে উপস্থিত থাকলে সবকিছু ঠিক চলতে বাধ্য। তাই চরিত্রাভিনেতা হিসেবে বিশ্ববন্দিত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম পছন্দেরও ছিলেন তিনিই।

ব্যক্তিজীবনে রবি ঘোষ বাস্তবিকই ছিলেন এক আমবাঙ্গালি। ছিলেন আড্ডাবাজ, পরোপকারী। খেতে ভালোবাসলেও অভিনয়ের জন্যই খুবই পরিমিত আহারে নিজেকে সীমিত রাখতেন। তাঁর প্রিয়খাবার ছিল লুচি ও পাঠার মাংস। তার প্রথম স্ত্রী অনুভা গুপ্তর সঙ্গেও তার সম্পর্কের শুরু 'হাঁসুলীবাকের উপকথা' ছবি করার সময়। ১৯৭২ সালে সেই অনুভাদেবীর অকালমৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। অনুভাদেবীর মৃত্যুর সুদীর্ঘ এক দশক পর তিনি বৈশাখী দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৫২ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এলটিজি-র অভিনেতা ও স্টেজ ম্যানেজার। এই সময় মৃণাল সেন 'সাংবাদিক' নাটকে পনেরো সেকেন্ডের হকারের পার্ট দেখে 'ইউনিটি' কাগজে নাটকের রিভিউ করতে গিয়ে, রবি ঘোষকে নিয়ে একটা আস্ত প্যারা লেখেন। এতদিনে নিজের কাজ ও মিশুকে স্বভাবের জন্য চলচ্চিত্র জগতে তিনি সুপরিচিত রবি ঘোষ নামে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদার থেকে তাঁর

নামের সংক্ষিপ্তকরণ চলচ্চিত্র জগতের জন্যই করা হয়েছিল।

১৯৫৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শোধবোধ’ নাটক পরিচালনা করেন তিনি। এ যেন এক অদ্ভুত সমাপতন। তারপর থেকেই বাঙ্গালির মননে চিন্তনে অন্তহীন দুই রবির অধিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবি ঘোষ। কমলকুমার মজুমদারের সংস্পর্শে এসে শাস্ত্রীয়সঙ্গীত, নৃত্য এক কথায় উচ্চাঙ্গ শিল্পের আঙিনায় চলে আসেন রবি ঘোষ। ওই বছরই ‘ছায়ানট’ পরিচালনা করেন। তারপর সিরাজদৌল্লায় দানশা ফকিরের চরিত্রাভিনয় এবং ১৯৫৯ সালে স্টেজ ম্যানেজারের পদ থেকে অব্যাহতি নেন তিনি।

১৯৫৯ সালেই মিনার্ভাতে ‘নীচের মহল’ অভিনয় করতে গিয়ে তিনি বুঝলেন, এতদিন যাঁদের প্রশংসা পেয়ে এসেছেন, তাঁরা সংখ্যায় কত নগণ্য। একদিন পঞ্চাশজন দর্শক এসেছেন তার মঞ্চাভিনয় দেখতে, দর্শকদের একজন পণ্ডিত রবিশঙ্কর! সেদিনের অভিনয় শুধু তাঁর জন্য হলো। ফল হলো এই, শো শেষে ব্যাক স্টেজে গিয়ে রবিশঙ্কর বললেন, তিনি বিনা পারিশ্রমিকে এলটিজি-র একটা নাটকে মিউজিক করতে চান। এর ফলে ১৯৫৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর উৎপল দত্তের পরিচালনায় রবিশঙ্করের আবহসংগীত, তাপস সেনের আলো সব নিয়ে এলটিজি-র নিবেদনে মঞ্চস্থ হলো ‘অঙ্গার’। বাকিটা ইতিহাস। তিনশো নাইট হাউসফুল। রবি ঘোষ সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন। ১৯৫৯ সালেই (উল্টোরথ) শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতা পুরস্কারও লাভ করেন অঙ্গারের জন্য। আবার সেই ১৯৫৯ সালেই তিনি ‘আহ্বান’ চলচ্চিত্রে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চরিত্রে অভিনয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি তপন সিনহার ‘গল্প হলেও সত্যি’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রবি ঘোষ ১৯৬০ সালে নীতিগত বৈষম্যের কারণে স্মৃতিমেদুর এলটিজি ছাড়লেন। ১৯৬১-তে তপন সিংহ তাঁকে ডাকলেন ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’-তে অভিনয় করার জন্য। তিনি কী করলেন তখন, জানেন? একটা কনভেক্স লেন্সের আয়না কিনে ফেললেন— মুখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি নিরীক্ষণ করার জন্য। পাগলের মতো পৃথিবীর সেরা চলচ্চিত্রাভিনেতাদের অভিজ্ঞতা পড়ে, নোট নিতে লাগলেন। মঞ্চ থেকে ছায়াছবিতে আসা নিকোলাই চেরকাসোভের ‘নোটস অব আ সোভিয়েট অ্যাক্টর’ কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। বাস্তবিকই তাঁর চলচ্চিত্র সফর শুরু হলো।

এরপর কমেডি। তিনি বলতেন, ‘টাইমিং’, ‘পজ’ ও ‘এক্সপ্রেশন’ এই তিনের সমন্বয় না হলে, তৎসহ বডি ফিটনেস না থাকলে সার্থক কমেডি হয় না। বলতেন, যে কমেডি হাসায় ও ভাবায়, সেটাই সঠিক কমেডি। জীবনকে পরিচ্ছন্ন করার ব্যাপারে হাসির একটা ভূমিকা আছে। সার্থক কমেডি সেই কাজটা করে। একজন অভিনেতা ও চলচ্চিত্র জগতের দার্শনিক হিসেবে তাঁর দর্শন ছিল অনস্বীকার্য। আবার তিনি নিজেই জানতেন, বাস্তবজীবনে এর প্রয়োগ কত দুরূহ। জীবিকা নির্বাহ করতে বহু ছবি তাঁকেও করতে হয়েছে, যেখানে তাঁর দর্শন ছিল অচল। সারকারিনায় ক্ষীয়মাণ পেশাদারি মঞ্চে অভিনয় করতে গিয়ে অভিব্যক্তিতে তার ফ্রাসট্রেশনের প্রকাশ কারো অগোচরে থাকেনি। ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে বিবর, শ্রীমতী ভয়ঙ্করী (শেক্সপিয়র অনুসৃত) প্রভৃতি হাউসফুল নাটক করার পর সারকারিনায় তার নিজের ভাষায়— অতীব নীচ প্রকৃতির দুষ্টচক্র তাকে অভিনেতা হিসেবে ভেরতে ভেতরে ধ্বস্ত করেছিল। তবুও তিনি হেরে যাননি। নিজের অভিনয় সত্তাকে সমর্পণ করেননি দুষ্টচক্রের যাঁতাকলে।

১৯৬৮ সালে সত্যজিৎ রায় নির্মিত গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে ‘বাঘাবাইন’ চরিত্রে তাঁর অভিনয় পশ্চিমবঙ্গের তো বটেই ভারতের চলচ্চিত্র জগতেও মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি উপহার দিয়েছিলেন অভিযান (১৯৬২), অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৭০), নৌকাডুবি (১৯৭৯), হীরক রাজার দেশে (১৯৮০), গুপিবাঘা ফিরে এলো (১৯৯১), আগন্তুক (১৯৯১), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৯৩) প্রভৃতি উপমহাদেশখ্যাত চিত্তাকর্ষক ছায়াছবি। যে ছায়াছবিগুলোতে তাঁর কমেডি ও অভিনয় দক্ষতার এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটেছিল যার উপর ভিত্তি করে বাঙ্গলার চলচ্চিত্র জগৎকে তিনি বস্তুতই পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে। ভারতের চলচ্চিত্র জগতে বাঙ্গলার জন্য বয়ে এনেছেন এক অনন্য স্থান। বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছেন নিজের নাম। ■

দিশেহারা তৃণমূল অতিদ্রুত ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে

সংবাদদাতা॥ গত ৬ ডিসেম্বর রবিবার আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান ও ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির ডাকে বন্ধ তিন জেলায় রেল রোকো ও চক্কা জ্যাম কর্মসূচি পালন। বিভিন্ন স্টেশনে রেল লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা এতে আটকে পড়ে এতদ অঞ্চলের দার্জিলিং মেল, কাঞ্চনজঙ্ঘা-সহ বেশ কয়েকটি ট্রেন। এছাড়াও কয়েক জায়জায় ভারতীয় সড়ক অবরোধও করা হয়।

এদিনই বিমল গুরুংয়ের শিলিগুড়ি গান্ধী ময়দানে জনসভা করার কথা। সকলা ১০টার সময় বিমলের পৌঁছানোর কথা থকেলেও অবরোধের জেরে তাঁর ট্রেন আটকে পড়ে। তাই তিনি বিকাল ৪টা নাগাদ সড়কপথে গান্ধী ময়দানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। ২০০৮ সালে এই গান্ধী ময়দান থেকেই গোর্খাল্যান্ডের জিগির তুলেছিলেন। আবার দীর্ঘ ১২ বছর পর এই সভাস্থল থেকে একই সুর শোনা গেল জনসভায়। তিনি বলেন, গোর্খাল্যান্ডই তার লক্ষ্য। তৃণমূলের পাশে থেকে বিজেপিকে সবক শেখানোর ডাক দেন তিনি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, কিছুটা হলেও বিমল গুরুংয়ের পাহাড়ে জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েছে। ২০০৮ সালের তুলনায় অনেক কম মানুষ সভায় হাজির হয়েছিলেন।

তথ্যভিজ্ঞ মহলের মতে, তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের কিছু নেতার বিরুদ্ধে কাটমানি, তোলাবাজি-সহ নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। যা শাসকদলের বিড়ম্বনা ও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে তৃণমূলের নেতৃত্বের রাতের ঘুম কেড়েছে বলে । কারণ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্য থেকে ১৮টি আসনে জেতা বিজেপি ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্য পেয়ে ক্ষমতায় চলে আসবে এমন ভাবনা তৃণমূল নেতৃত্বকে দিশেহারা করছে।

তাই বিগত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে, আঁচ করে দলের সুপ্রিমো মমতা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাজিমাত করার লক্ষ্যে ভোটকৌশলী পি.কে.-র মুখাপেক্ষী হয়েছেন। কিন্তু পি.কে. যে আদৌ কতটা সাফল্য এনে দিতে পারবেন, তা নিয়ে দলের অভ্যন্তরেই প্রশ্ন উঠছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল নেতৃত্বকে নির্বাচনের ঠিক আগে দলের এমন নড়বড়ে অবস্থাকে নিঃসন্দেহে ভাবাচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যেই দলের কবর নিজেই অনেকটাই খুঁড়ে ফেলেছে তৃণমূল। একদিকে যেমন কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী দলীয় আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপি যোগ দিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারীর দল ছাড়ার সম্ভাবনাও এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়াও অনেক তৃণমূল নেতাই বিজেপির দিকে পা বাড়িয়ে রেখেছেন বলে প্রকাশ। তাই দলের সঙ্কটটা মারাত্মক চেহারা নিয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই তৃণমূল নেতৃত্বের।

এদিকে দিশেহারা হয়ে তৃণমূল কখনো গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে জোট বাঁধছেন, আবার সিপিএম ও কংগ্রেসের সঙ্গেও সন্ধি করার চেষ্টা করছেন। আবার রাজ্যে প্রচারে আসা বিজেপি কার্যকর্তাদের 'বহিরাগত' তকমা দিতেও পিছপা হচ্ছেন না। সম্প্রতি বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতির ওপরে তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণ তৃণমূলকে বেশ ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছে।

অতি সম্প্রতি কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাংবাদিক বিষয়ে 'দু পয়সার প্রেস' বলে সাংবাদিকদের এমন অবমাননাকর বক্তব্যের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য-সহ উত্তরদিনাজপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইসলামপুর মহকুমা প্রেসক্লাব ও কালিয়াগঞ্জ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে আজ একি তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। এতে ইসলামপুর মহকুমা প্রেসক্লাবের সদস্যরা প্রেস কার্যালয় থেকে ইসলামপুর বাসটার্মিনাস হয়ে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর-সহ ইসলামপুর কোর্ট চত্বর এলাকা দিয়ে প্রেস কার্যালয়ের সামনে এসে এই বিক্ষোভ মিছিল শেষ করা হয়।

এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল প্রেসক্লাবের সদস্যরা ট্যাবলো-সহ মহুয়া মৈত্রের সাংবাদিকদের এমন অবমাননাকর উক্তির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে কার্যালয় থেকে উপরোক্ত এলাকা পরিক্রমা করেন এবং সাংসদকে জনসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করার দাবিও জানানো হয়।

যদি সাংবাদিকদের এই দাবি না মানা হয়, তবে আগামীতে রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিকগণ সাংসদের জনসভা বয়কট-সহ বৃহত্তর বিক্ষোভ আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হবে বলে প্রকাশ।

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE NEW AGE PANELS
SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

Dil main
INDIA
Let's illuminate the nation with Make in India
SURYA
MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES
AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | Toll Free No.: 1800 102 5657